সাঁতারু ও জলকন্যা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সাঁতারু ও জলকন্যা

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

‘রা-স্বা’

শ্রীপরেশচন্দ্র ভোরা
শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

অনেকের গল্প
অসুখের পরে
আদম ইভ ও অন্ধকার
আলোয় ছায়ায়
আলোর গল্প, ছায়ার গল্প
আশ্চর্য ভ্রমণ
উজান
উপন্যাস সমগ্র (১ম-৮ম খণ্ড)
ঋণ
কাগজের বউ
কাপুরুষ
কালো বেড়াল সাদা বেড়াল
কীট
কোনও দিন এরকমও হয়
কোলাজ
ক্ষয়
খেলনাপাতি
গতি
গয়নার বাক্স
গুহামানব
ঘুণপোকা
চক্র
চুরি
চোখ
জাল
ঝাঁপি

দ্বিতীয় সত্তার সন্ধানে
ধন্যবাদ মাস্টারমশাই
নরনারী কথা
নানা রঙের আলো
নীচের লোক উপরের লোক
নীলু হাজরার হত্যারহস্য
পরিহাটির হরিণ
পারাপার
পার্থিব
পিদিমের আলো
প্রজাপতির মৃত্যু ও পুনর্জন্ম
ফজল আলি আসছে
ফুলচোর
বনদেবী ও পাঁচটি পায়রা
বাঁশিওয়ালা
বিকেলের মৃত্যু
ভুল করার পর
মাধব ও তার পারিপার্শ্বিক
মানবজমিন
ম্যাডাম ও মহাশয়
যাও পাখি
রহস্য সমগ্র
লাল নীল মানুষ
শিউলির গন্ধ
শ্যাওলা

দশটি উপন্যাস

দিন যায়

দূরবীন

দ্বিচারিণী

সতীদেহ

সন্ধি প্রস্তাব

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে

হৃদয়বৃত্তান্ত

সূচিপত্র

এক

জলের ঐশ্বর্যকে যেদিন প্রথম আবিষ্কার করেছিল অলক সেদিন থেকেই ডাঙ্গাজমির ওপরকার এই বসবাস তার কাছে পানসে হয়ে গেল। একদা কোন শৈশবে প্লাস্টিকের লাল কোনও গামলায় কবোষ্ণ জলে তাকে বসিয়ে দিয়েছিল মা। জলের কোমল লাবণ্য ঘিরে ধরেছিল তাকে। সেই থেকে জল তার প্রিয়। বাড়ির পাশেই পুকুর, একটু দূরে নদী। ভাল করে হাঁটা শিখতে না শিখতেই সে শিখে ফেলল সাঁতার। সুযোগ পেলেই পুকুরে ঝাঁপ, নদীতে ঝাঁপ। মার বকুনি, তর্জন-গর্জন সব ভেসে যেত জলে। যে গভীরতা জলে সেরকম গভীরতা আর কিছুতেই খুঁজে পেত না অলক। খুব অল্প বয়সেই সে আবিষ্কার করেছিল জলের সবুজ নির্জনতাকে। নৈস্তব্ধকে।

জল থেকেই সে তুলে এনেছে বিস্তর কাপ আর মেডেল! মুর্শিদাবাদে গঙ্গায় দীর্ঘ সাঁতার, পাক প্রণালীর বিস্তৃত জলপথ, জাতীয় সাঁতার প্রতিযোগিতা, সব জায়গাতেই অলকের কিছু না কিছু প্রাপ্তি হয়েছে। রাজ্যের হয়ে সে বেশ কিছুদিন খেলেছে ওয়াটারপোলো। ঘরে আলমারির পর আলমারি ভর্তি হয়েছে নানাবিধ পুরস্কারে। কিন্তু অলক—একমাত্র অলকই জানে, কাপ মেডেলের জন্য কখনোই সে সাঁতার কাটেনি। জলের মধ্যেই তার জগৎ, জলের মধ্যেই তাঁর আত্ম-আবিষ্কার, জলই তাঁর দ্বিতীয় জননী।

জলের কাছে সে শিখেছেও অনেক। তার স্বভাব শান্ত, সে ধৈর্যশীল, কম কথার মানুষ।

তার ছেলেবেলায় একদিনকার একটি ঘটনা। বাড়ির একমাত্র টর্চটাকে কে যেন ভেঙে রেখেছিল। মা তাকেই এসে ধরল, তুই ভেঙেছিস।

অলক প্রতিবাদ করতে পারল না। সে ধরেই নিয়েছিল সত্যি কথা বললেও মা তাকে বিশ্বাস করবে না। একজনের ঘাড়ে টর্চ ভাঙার দায়টা চাপানো দরকার। সুতরাং সে দু-চার ঘা চড়-চাপড় নীরবে হজম করল,

মাথা নীচু করে সয়ে নিল ঝাল বকুনি।

ব্যাপারটা মিটে গেল।

পরদিনই অবশ্য টর্চ ভাঙার আসল আসামী ধরা পড়ল। তার দিদি। তখন মা এসে তাকে ধরল, কাল তাহলে বলিসনি কেন যে, তুই ভাঙিসনি?

অলক একথারও জবাব দিল না।

মা খুব অবাক হল। চোখে শুধু বিস্ময় নয়, একটু ভয়ও ছিল মায়ের। যাকে বোঝা যায় না, যে কম কথা বলে এবং যার অনেক কাজই স্বাভাবিক নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় না, তার সম্পর্কে আশেপাশের লোকের খানিকটা ভয় থাকে। কী ছেলে রে বাবা!

অলককে নিয়ে মা আর বাবা দুজনেরই নানা দুশ্চিন্তা ছিল। শান্ত, প্রতিবাদহীন এই ছেলেটিকে তাদের বুঝতে অসুবিধে হত। তার বায়না নেই, খিদে পেলেও মুখ ফুটে খেতে চায় না, সাতটা কথার একটা জবাব দেয়।

পাড়ায় সোমা নামে একটি পাজি মেয়ে ছিল। একদিন সে এবং তার বাড়ির লোকেরা শোরগোল তুলল, অলক নাকি সোমাকে একটা প্রেমপত্র দিয়েছে। খুব অশ্লীল ভাষায়। এই নিয়ে সারা পাড়া তুলকালাম। সোমার বাড়ি ঝগড়ুটে বাড়ি বলে কুখ্যাত। পুরো পরিবার এসে চড়াও হয়ে অলক এবং তার বাপ-মাকে বহু আকথা-কুথা শুনিয়ে গেল, পাড়ার লোকও শুনল ভীড় করে। অলক জবাব দিল না, একটি প্রতিবাদও করল না। পরে তার বাবা রাগের চোটে একটা ছড়ি প্রায় তার শরীরে ভেঙে ফেলল পেটাতে পেটাতে। তারপর হাল ছেড়ে দিল।

পরে যখন চিঠির রহস্য ফাঁস হয় তখনও অলক নির্বিকার। সেই চিঠি অলকের হাতের লেখা নকল করে লিখেছিল সোমা নিজেই। কেন লিখেছিল তা সে নিজেও জানে না। বয়ঃসন্ধিতে ছেলে-মেয়েদের মন নানা পাগলামি করে থাকে। সোমা সম্ভবত অলকের প্রেমে পড়ে থাকবে এবং তার মনোযোগ আকর্ষণের নিরন্তর চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ওইভাবে প্রতিশোধ নেয়। একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল ঠিকই এবং সেইজন্য সে পরে অনেক চোখের জল ফেলেছে।

কিন্তু যার জন্য এত কিছু, সে সুখে দুঃখে নির্বিকার সাঁতরে চলেছে পুকুরে, নদীতে, সমুদ্রে কিংবা বাঁধানো সুইমিং পুল-এ। ডাঙ্গায় যা ঘটে তার সবকিছুই সে ধুয়ে নেয় তার প্রিয় অবগাহনে। জলই তাকে দেয় আশ্রয়, ক্ষতস্থানে প্রলেপ, বেঁচে থাকার রসদ।

এক-একদিন খুব ভোরবেলা কুয়াশামাখা আবছা আলোয় একা লেকের জলে রোয়িং করতে করতে তার আদিম পৃথিবীর কথা মনে হয়। আগুনের গোলার মতো তপ্ত পৃথিবীর আকাশে তখন কেবলই পরতের পর পরত জমে যাচ্ছে নানা গ্যাস ও বাষ্প। কত মাইল গভীর সেই মেঘ কে বলবে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জমা হয়েছিল মেঘ। তারপর ক্রমে ক্রমে জুড়িয়ে এল পৃথিবী। একদিন সেই জমাট মেঘ থেকে শুরু হল বৃষ্টি। চলল হাজার হাজার বছর ধরে। বিরামবিহীন, নিশ্ছিদ্র। জল পড়ে, তৎক্ষণাৎ বাষ্প হয়ে উড়ে যায় আকাশে, ফের জল হয়ে নামে। কত বছর ধরে চলেছিল সেই ধারাপাত কে জানে। তবে সেই বৃষ্টিও একদিন থামল। পরিষ্কার হয়ে গেল আকাশ। দেখা গেল সমস্ত পৃথিবীটাই এক বিশাল জলের গোলক। তারপর ধীরে ধীরে জল সরে যেতে লাগল নানা গহ্বরে, ঢালে, নাবালে। মাটি আর জলে আর রোদে শুরু হল প্রাণের এক বিচিত্র লীলা।

উদ্ভিদে, জলজ প্রাণীতে, স্থলচরে সেই প্রাণের যাত্রা চলতে লাগল। অলকের মনে হয়, সেই আদিম প্রাণের খেলায় সেও ছিল-কোনও না কোনওভাবে। তার রক্তে, তার চেতনায় সেই পৃথিবীর স্মৃতি আছে। সে কি ছিল জলপোকা? মাছ? শ্যাওলা?

খেলোয়াড়দের নানা রকম উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, থাকে একটু আলাদা রকমের পৌরুষের বোধ, কিছু গ্ল্যামারও। মোটামুটি নামকরা একজন সাঁতারু হওয়া সত্ত্বেও অলকের এইসব বোধ নেই। সে যে একজন সাঁতারু এ-কথাটাই তার মনে থাকে না। মাঝে-মধ্যে কেউ অটোগ্রাফ চাইলে সে একটু চমকেই ওঠে। ভারী সঙ্কোচও বোধ করে। মার্ক স্পিৎজ হওয়ার জন্য তো আর সে সাঁতরায় না। জল তার পরম নীল নির্জন, জল তার এক আকাঙ্ক্ষিত একাকিত্ব, জলে সে আত্মার মুখোমুখি হয়।

দুই বোনের মাঝখানে সে, অর্থাৎ অলক। বড় বোন অর্থাৎ দিদি মধুরা এবং বোন প্রিয়াঙ্গি যে যার স্বক্ষেত্রে সফল। বিশেষত মধুরা ছিল যেমন ভাল ছাত্রী তেমনি সে গানে বাজনায় ওস্তাদ। এক চান্সে সে ডাক্তারি পাশ করে গেছে। প্রিয়াঙ্গি এখনও কলেজে, গানে বিশেষত রবীন্দ্রসঙ্গীতে, সে ইতিমধ্যেই গুঞ্জন তুলেছে। একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের তিনটি সন্তানের দুটিরই এরকম সাফল্য বেশ একটা বলার মতো ঘটনা। সেদিক দিয়ে তাদের বাবা সত্যকাম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা মনীষা যথেষ্ট ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী। মধ্যম সন্তানটি তাদের ডোবায়নি বটে, কিন্তু সে নিজেই এক সমস্যা। সত্যকাম এবং মনীষা দুজনেই কালচারের লাইনের লোক। দুজনেরই গানের চর্চা ছিল, অভিনয়ের অভিজ্ঞতা ছিল। সত্যকাম একটা শৌখিন নাটকের দল চালিয়েছিল দীর্ঘকাল। মনীষা শান্তিনিকেতনে পড়ার সময় বহু নৃত্যনাট্য করেছে। এই পরিবারে একজন সাঁতারুর জন্মানোর কথা নয়। উপরন্তু যে সাঁতারুর গানবাজনা ইত্যাদির প্রতি আকর্ষণ নেই। তবু, মনের মতো না হওয়া সত্ত্বেও

সত্যকাম এবং মনীষা ছেলেকে আকণ্ঠ ভালোবাসার চেষ্টা করেছে। সত্যকাম জেনারেশন গ্যাপ তত্ত্বটা তত্ত্ব হিসেবে মানে বটে, কিন্তু তেমন বিশ্বাস করে না। তার ধারণা ছিল ছেলের বন্ধু হয়ে উঠতে তার আটকাবে না। সে নিজে মিশুক, উদার, অভিনয়পটু। সে নিশ্চয়ই পারবে। কিন্তু পারল না। অলকের চারদিকে যে একটা অদ্ভুত অদৃশ্য কঠিন খোল সেটাই তো ভাঙতে পারল না সে।

হতাশ হয়ে একদিন সে মনীষাকে বলেছিল, ইট ইজ নট জেনারেশন গ্যাপ।

তাহলে কী?

সামথিং মোর আরবান। ও বোধহয় কামুর সেই আউটসাইডার।

মনীষা ফোঁস করে উঠে বলল, তুমি ছাই বোঝো। আমার ছেলেকে আমি বুঝি।

কথাটা মিথ্যে নয়। মনীষা খানিকটা বোঝে। আর বোঝে বলেই তেমন ঘাঁটায় না। আবার মনীষা অলকের অনেকটাই, বেশিরভাগটাই বোঝে না। এই না-বোঝা অংশটা তার অহংকে অহরহ নিষ্পেষিত করে। মা হয়ে ছেলেকে বুঝতে না পারার মতো আর কষ্ট কী আছে?

সত্যকাম দুবার দুটো সিনেমা ম্যাগাজিন বের করেছিল। ফিল্মে সে বেশ কিছুদিন এক বিখ্যাত পরিচালকের সহকারী থেকেছে। একাধিক বৃহৎ ফাংশনের ইমপ্রেশারিও হয়েছে। এখন সে একটি ইংরিজি দৈনিক পত্রিকার ফিল্ম সেকশনে চাকরি করে। মাইনে যথেষ্ট ভাল, কিন্তু সত্যকাম এটুকুতে খুশি নয়। আরও অনেক বড় হওয়ার কথা ছিল তার, এবং স্বাধীন। সুতরাং এখনও সে হাল ছাড়েনি। মাঝে-মধ্যেই শর্ট ফিল্ম তোলে, ফিচার ফিল্মের স্ক্রিপ্ট করে এন এফ ডি সি-তে ধর্ণা দেয় এবং প্রযোজক খুঁজে বেড়ায়। টুকটাক দুটো-একটা ছবি সে মাঝে-মধ্যে তুলেও ফেলে। কোনোটাই বাজার তেমন গরম করে না। কিন্তু এসব নিয়ে এবং দিল্লি বোম্বাই করে সত্যকাম খুবই ব্যস্ত থাকে। একটা কিছু করছে, থেমে যাচ্ছে না, এই বোধটাই তার কাছে এখন অনেক। বয়স চল্লিশের কোঠায়, পঞ্চাশের মোহনায়। এখনও বাড়ি হয়নি, গাড়ি নেই, বড় মেয়ের বিয়ের খরচের কথা সব সময়ে মনে রাখতে হয়।

মনীষার উচ্চাকাঙ্ক্ষা রেডিও এবং টেলিভিশনে প্রোগ্রাম পাওয়া পর্যন্ত থমকে গেছে। মাঝে-মধ্যে গায়। একটা-দুটো রেকর্ড হয়েছিল একদা। মাঝে-মধ্যে ফাংশনে গাইবার ডাক পায়। তবে মনীষার একটা বেশ রমরমে নাচগানের স্কুল আছে। তা থেকে আয় মন্দ হয় না। আয়ের চেয়েও বড় কথা, মেতে থাকা যায়। একটা কিছু করছে, কাউকে কিছু শেখাচ্ছে, এটাও বা কম বোধ কিসের? চল্লিশ সেও পেরিয়েছে। আজকাল অবশ্য এটা তেমন কোনও বয়স নয়। কিন্তু মনীষা আর তেমন কোনও উচ্চাশার হাত ধরে হাঁটে না। তার উচ্চাশা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে দুটো মেয়ের ওপর। মধুরা আর প্রিয়াঙ্গি যদি কিছু করতে পারে তবেই হল। মনীষা এটাও বোঝে মিডিওকারদের যুগ এটা নয়। মাঝারিরা চিরকাল মাঝবরাবর মধ্যবিত্ত থেকে যায়, কী প্রতিভায়, কী সাফল্যে। মধুরা মাঝারির চেয়ে অনেকটা উঁচুতে, প্রিয়াঙ্গি অনেকটাই মাঝারি।

অলক কেমন? না, তা মনীষা বা সত্যকাম জানে না। তারা অলকের আনা কাপ মেডেলগুলো খুব যত্ন করে সাজিয়ে রাখে। দুঃখের বিষয় সত্যকাম সাঁতার জানেই না, মনীষা একটু-আধটু জানে না-জানার মতোই। ছেলে সম্পর্কে সত্যকাম একবার বলেছিল, ও যদি সাঁতারই শিখতে চায় তো বহোৎ আচ্ছা। চলে যাক পাতিয়ালা বা এনিহোয়ার, ভাল কোচিং নিক, লেট হিম গো টু এশিয়াড অর ইভন অলিম্পিকস্।

মনীষা বাধা দিয়ে বলেছিল, ওসব ওকে বলতে যেও না। আমি যতদূর জানি ও সাঁতার দিয়ে নাম করতে চায় না। প্লীজ, ওকে ওর মতো হতে দাও।

সত্যকাম বুদ্ধিমান। ছেলে আর তার মধ্যে জেনারেশন বা অন্য কোনও গ্যাপ যে একটা আছে, তা সে জানে। তাই সে চাপাচাপি করল না। শুধু চাপা রাগে গনগন করতে করতে বলল, সাঁতার তো খারাপ কিছু নয়। আমি বলছিখারাপ কিছু নয়। আমি বলছি —

প্লীজ, কিছু বলতে হবে না। লেট হিম বি অ্যালোন।

লেখাপড়ায় অলকের তেমন ভাল হওয়ার কথা নয়। সারা বছর নানা কমপিটিশনে যেতে হলে পড়াশুনো হয়ও না তেমন। কিন্তু বেহালার যে স্কুলে সে পড়েছে বরাবর সেই স্কুলের মাস্টারমশাইরা দেখে অবাক হয়েছেন যে এক-একবার এক-এক বিষয়ে অলক সাংঘাতিক নম্বর পায়। কোনওবার ইতিহাসে শতকরা আশি, কখনও অঙ্কে নব্বই, কখনও বাংলায় পঁচাত্তর বা ইংরিজিতে সত্তর। অর্থাৎ কোন বিষয়ের প্রতি যে তার পক্ষপাত সেটা বোঝার উপায় নেই। টেস্টের পর মাস্টারমশাইরা একটা কোচিং খুলে তাতে অলককে ভর্তি করে নেন এবং এই বিখ্যাত সাঁতারু ছেলেটিকে যত্ন করে তৈরি করে দেন। তারই ফলে অলক হায়ার সেকেন্ডারি ডিঙোয় ফার্স্ট ডিভিশনে। টায়ে-টায়ে। ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর ইচ্ছে ছিল সত্যকামের। অলক রাজি হয়নি। সে গেল নেভিতে ভর্তি হতে। হল, কিন্তু ছ' মাস পর ফিরে এসে বলল, ভাল লাগল না। পরের বছর বি এ ক্লাসে ভর্তি হল। সাদামাটাভাবে পাশ করে গেল।

চাকরির অভাব অলকের নেই। রেল ডাকে, ব্যাঙ্ক ডাকে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও ডাকে। বার দুই-তিন চাকরি বদলাল সে।

দিল্লির ট্রেন ধরবে বলে সকালে তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে ডিম-ভর্তি মুখে সত্যকাম মনীষাকে বলল, তোমার নাচের স্কুলে নতুন একটা মেয়ে ভর্তি হয়েছে। সুছন্দা। এ ভেরি বিউটিফুল গার্ল। পারো তো ওকে অলকের সঙ্গে ভিরিয়ে দাও।

মনীষা রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, তার মানে?

লেট দেম মিক্স। তাতে ছেলেটার খানিকটা চোখ খুলবে, অভিজ্ঞতা হবে, তারপর যদি বিয়ে করতে চায় তো লেট দেম।

কী যে সব বলো না! ছেলে কি গিনিপিগ যে তার ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালাবে! ওকে নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না।

একটা লঙ্কাকুঁচি কামড়ে ঝালমুখে উঃ আঃ করতে করতে উঠে পড়ে সত্যকাম। কিন্তু দিল্লি পর্যন্ত আইডিয়াটা তার মাথায় থাকে। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সেও সে বেশ রোমান্টিক। এখনও সে টিন এজারদের নিয়ে ভাবে। মেয়েদের সঙ্গে তার মেলামেশা ব্যাপক, গভীর এবং সংস্কারমুক্ত।

সত্যকাম দিল্লি চলে যাওয়ার পরদিনই নাচের ক্লাসে সুছন্দাকে একটু আলাদা করে লক্ষ করল মনীষা। মোটেই তেমন কিছু দেখতে নয়। খারাপও নয় তা বলে। কিন্তু আহামরিও বলা যায় না। মনীষা বারবারই সুছন্দার নাচের নানা ভুল ধরতে লাগল। দু-একবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধমকও দিল।

ক্লাসের পর বাড়ি ফিরেই প্রিয়াঙ্গির ডাকনাম ধরে ডেকে বলল, এই ঝুমুর, অলক কোথায় রে?

দাদা! দাদা তো সকাল থেকেই বাড়িতে নেই।

কোথায় যায় রোজ এসময়ে? আমার নাচ-গানের ক্লাসের কাছে গিয়ে ঘুরঘুর করে না তো?

তোমার নাচ-গানের ক্লাস! দাদা তো বোধহয় জানেই না তোমার নাচ-গানের ক্লাস কোথায়। কেন মা?

মনীষার মেজাজটা খারাপ ছিল। জবাব দিল না।

কথাটা অবশ্য মনে রাখল প্রিয়াঙ্গি। দুপুরে আবার সন্তর্পণে কথাটা তুলে জিজ্ঞেস করল, দাদাকে কি তোমার সন্দেহ হয়? দাদা সেরকম নয় কিন্তু।

মনীষা এর জবাবে বলল, সুছন্দাকে তো দেখেছিস! কেমন দেখতে বল তো!

কেন, বেশ তো।

কি জানি বাবা, আমিই বোধহয় কিছু বুঝি না।

কেন মা, কী হয়েছে? সুছন্দার সঙ্গে দাদার কি ভাব?

দুই

চাঁপারহাটের দাসশর্মাদের বাড়িতে বনানী নামে যে বামুনের মেয়েটা কাজ করে সে বামুন না বাগ্‌দী সে কথাটা বড় নয়। বড় প্রশ্ন হল মেয়েটা এখনও বেঁচে আছে কোনওরকমে।

বনানীর শোওয়ার জায়গাটা একটু অদ্ভুত। স্বাভাবিক খাট-বিছানা তাকে দেওয়া হয় না। সে শোয় লাকড়ি-ঘরের পাটাতনে। খানিকটা শুকনো খড় পুরু করে পেতে তার ওপর দুটো চট বিছিয়ে তার শয্যা। গায়ে দেওয়ার একটা তুলোর কম্বল আছে তার। আর একটা সস্তা নেটের ছেঁড়া মশারি। ফুটো আটকানোর জন্য নানা জায়গায় সুতো বাঁধা। গেরস্তর দোষ নেই। বনানী তেরো বছর বয়সেও বিছানায় মাঝে মাঝে পেচ্ছাপ করে ফেলে। নিজেই চট কাচে, খড় পাল্টায়। বড়ই রোগাভোগা সে। তেরো বছরের শরীর বলে মনেই হয় না। হাড় জিরজির করছে শরীরে। হাঁটুতে কনুইয়ে গোড়ালিতে কণ্ঠায় হনুতে হাড়গুলো চামড়া যেন ঠেলে বেরিয়ে আছে। মাথাটা তার প্রায় সর্বদাই ন্যাড়া। কানে দীর্ঘস্থায়ী ঘা। ঘা কনুইয়ে, মাথায়, হাঁটুতেও। বনানী ফর্সা না শ্যামলা তা তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই। রোগা শরীরটায় একটা পাকাপাকি ধূসর বর্ণ বসে গেছে। তার মুখখানা কেমন তাও বলার উপায় নেই। হাড়ের ওপর চামড়ার একটা ঢাকনা, তাতে মনুষ্য অবয়ব আছে মাত্র।

দাসশর্মাদের প্রকাণ্ড সংসার। একশ বিঘের ওপর জমি। দুটো লাঙ্গল, একটা ট্র্যাক্টর। সারাদিন মুনীশ খাটছে, জন খাটছে, দাসদাসী খাটছে। বেহানবেলা কাক না ডাকতেই দাসশর্মাদের বাড়িতে শোরগোল পড়ে যায়। নিজের পাটাতনের বিছানায় শুয়েই বনানী শুনতে পায় উঠোনে গরুর দুধ দোয়ানোর চ্যাং-চ্যাং মিষ্টি শব্দ। সন্ধি ঝি উঠোন ঝ্যাঁটাতে থাকে, পৈলেন বালতি বালতি জল ঢেলে গোহাল পরিষ্কার করে, ডিজেল পাম্প চালিয়ে গুরুপদ জল দেয় বাগানে। বশিষ্ঠ দাসশর্মা তারস্বরে তাণ্ডব স্তোত্র পাঠ করতে থাকে। ভোরবেলায় চারদিককার

গাছগাছালিতে পাখিও ডাকে মেলা। উদুখলের শব্দ ওঠে। পৃথিবীর হৃৎপিণ্ডের মতো চলতে থাকে ঢেঁকি। এ বাড়িতে কত কী হয়।

বনানীর বড় ভাল লাগে এই সংসারটা। কারণ এখানে বেশ পালিয়ে লুকিয়ে থাকা যায়। এত লোকজন চারদিকে যে, তার বড় একটা খোঁজখবর হয় না। প্রথম প্রথম সে রান্নাঘরে কাজ পেয়েছিল। কিন্তু গায়ে ঘা বলে সেখান থেকে তাকে সরানো হয়। এরপর বামুনের মেয়ে বলে তাকে দেওয়া হয় পুজোর ঘরে। কিন্তু বনমালী পুরুত ক্ষতযুক্ত মেয়ের হাতের জল বিগ্রহকে দিতে নারাজ। বনানীকে তাই সেখান থেকেও সরানো হল। এখন বলতে গেলে তার কোনও বাঁধা কাজ নেই। শুধু এর ওর তার ফাইফরমাস খাটতে হয়। এই ফাইফরমাসের মধ্যে বেশীর ভাগই মুদির দোকানে যাওয়া।

বনানীর বাড়ি এই চাঁপারহাটেই। দাসশর্মাদের বাড়ি থেকে বেশী দূরও নয়। সেখানে তার বাবা আছে, মাসী আছে, মাসীর দুটো মেয়ে আছে। মাসীকে মাসীও বলা যায়, মাও বলা যায়। তবে মা বলতে কখনও ইচ্ছে করে না বনানীর। তার নিজের মা মরার পর যখন বাবা মাসীকে বিয়ে করতে গিয়েছিল তখন বাবার কোলে চেপে সেও যায়। বাবার বিয়ে সে খুব অবাক হয়ে দেখেছিল। এমন কি সাত পাকের সময়েও সে বাবাকে ছাড়েনি, কোলে চেপে কাঁধে মাথা রেখে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে বাবার সঙ্গে মাসীর শুভদৃষ্টি দেখেছিল। এখনও সব মনে আছে তার। দুরকম মাছ, আমড়ার চাটনী আর দৈ খেয়েছিল খুব বাবার কোলে বসে। প্রথম প্রথম মাসী কি কম আদর করেছে তাকে? চান করাতে, খাওয়াতো, সাজাতো। তারপর একদিন মাসীর একটা মেয়ে হল। তারপর আর একটা। তারপর কী যে হল তা বনানী ভাল বুঝতে পারে না। উঠতে বসতে বনানীর নামে বাবার কাছে নালিশ। তারপর মার শুরু হল। সঙ্গে গালিগালাজ। চান হয় না, খাওয়া হয় না, সাজগোজ চুলোয় গেল। বনানী কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেতে লাগল দিন দিন। মাসী তাকে দেখলেই রেগে যায়। প্রথম প্রথম তবু বাবা একটু আড়াল করত তাকে। পরে বাবাও গেল বিগড়ে। অত নালিশ শুনলে কার না মন বিষিয়ে যায়? বাড়ির অবস্থা আরও খারাপ হল যখন তার বাবার সঙ্গে মাসীর ঘন ঘন ঝগড়া লাগতে লাগল। সে এমন ঝগড়া যে পারলে এ ওকে খুন করে। সেই সময় তার বাবা হাটে গিয়ে নেশা করে আসা শুরু করল। বাড়িটা হয়ে গেল কুরুক্ষেত্র। কত সময় সাঁঝঘুমোনি বনানী মারদাঙ্গার শব্দে সভয়ে উঠে বসে বোবা চোখে বাবা আর মাসীর তুলকালাম কাণ্ড দেখেছে। মাসী কতবার গেছে গলায় দড়ি দিতে, তার বাবা কতবার গেছে রেললাইনে মাথা দিতে। শেষ অবধি কেউ মরেনি। এসব যত বাড়ছিল মাসীর রাগও তার ওপর তত চড়ে বসেছিল। প্রায় সময়েই বাবা বেরোনোর পর মাসী তাকে তুচ্ছ কারণে মারতে মারতে, লাথি দিতে দিতে ঘর থেকে বের করে দিত। সারাদিন বনানী বসে থাকত বাড়ির সামনে রাস্তার ধারে। অভুক্ত, কখন বাবা আসবে সেই আশায় পথ চেয়ে থাকা। বাবা আসত ঠিকই, কিন্তু সেই বাবা যে আর নেই তা খুব টের পেত বনানী।

চুরি করে খাওয়া তার স্বভাবে ছিল না কখনও। কিন্তু খিদের কষ্টটা এমন অসহ্য লাগত যে বনানী সামলাতে পারত না। একদিন ছোটো বোনের হাত থেকে বিস্কুট নিয়ে খেয়েছিল বলে মাসী তাকে হেঁটমুণ্ডু করে বেঁধে রাখে। আর তাই নিয়ে বাবা ক্ষেপে গিয়ে মাসীকে দা দিয়ে কাটতে যায়। আর তারই শোধ নিতে মাসী বনানীকে ভাতের সঙ্গে ইঁদুর-মারা বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। বনানী মরেই যেত, হেলথ সেন্টারের ডাক্তারবাবুটি ভাল লোক বলে তাকে বাঁচিয়ে দেয়। এর পরই বাবা ঠিক করে ও বাড়িতে বনানীকে আর রাখা ঠিক হবে না। তবে তার বাবা গগন চাটুজ্যে গরীব মানুষ, বিষয়-আশয় নেই। মেয়ের জন্য তেমন কিছু ব্যবস্থা

করার সাধ্য ছিল না তার। তবে বশিষ্ঠ দাসশর্মার সঙ্গে তার খুব ভাব ভালবাসা। সব শুনেটুনে দাসশর্মা বলেছিলেন, আমার বাড়িতেই দিয়ে দাও। কত লোক থাকে খায়, ওই রোগা মেয়েটা থাকলে কেউ টেরও পাবে না। বামুনের একটা মেয়ে থাকলে ভালই হবে। গুরুদেব আসেন, বামন অতিথ্-বিতিথ্ আসেন, বামুনের মেয়ে থাকলে সুবিধেও হবে।

বছর দুই আগে একটা পুঁটলি বগলে করে বাপের পিছু পিছু এসে সে এ বাড়িতে ঢোকে। ভারী মজার বাড়ি। চারদিকে কত লোক, কত মেয়েমানুষ, কত ছানাপোনা, কাচ্চাবাচ্চা। বনানী এ বাড়িতে আগেও এসেছে। তখন অন্যরকম ভাব ছিল। এবার এল কাজের মেয়ে হিসেবে। মাথা তাই নোয়ানো, লজ্জা-লজ্জা ভাব। তবে কিনা তার মতো অবস্থার মেয়ের বেশী লজ্জা থাকলে চলে না।

রোগাভোগা সে ছিলই। এখানে এসেও শরীরটা আর সারল না। তবে তার শরীর নিয়ে কারই বা মাথাব্যথা? বনানী ছুটতে পারে না, ভারী কাজ করতে পারে না, হাঁফিয়ে পড়ে। এ বাড়িতে তার যত্ন নেই, অযত্নও নেই। ঝি-চাকরদের সঙ্গেই তার খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। সে খাওয়া খারাপ নয়। ডাল, ভাত, তরকারি, কখনও-সখনও মাছ, কালেভদ্রে দুধ এবং পালাপার্বণে পিঠে-পায়েস বা পোলাও। বেশ আছে বনানী।

সকালে ঘুম ভেঙে উঠতে বড় কষ্ট হয় বনানীর। শরীরটা যেন বিছানার সঙ্গে লেপটে থাকতে চায়। মাথা তুললেই টলমল করে। অথচ এই ভোরবেলাটায় বাইরে ফিকে আলোয় পৃথিবীটা দেখলে তার বুক জুড়িয়ে যায়। এ সময়টা তার শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না।

উঠে প্রথমই সে বিছানাটা দেখে, পেচ্ছাপ করে ফেলেছে কিনা। যদি করে ফেলে থাকে তবে তার মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়। আর যেদিন না করে সেদিন তার মনটা বড় ভাল থাকে।

পুকুর ধারে পৈঠায় বসে ছাই দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে যখন সে কালো জলে ভোর আকাশের ছায়া দেখে তখন তার মনটা কেমন শান্তিতে ভরে ওঠে। তার রোজ এসময়ে মনে হয়, জলে আকাশে বাতাসে মউ মউ করছে ভগবানের গায়ের গন্ধ! তার মনে হয়, আমি কোনওদিন মরব না।

বশিষ্ঠ দাসশর্মার এক বিধবা দিদি আছে। এ বাড়িতে যেমন কিছু বাড়তি লোক থাকে, ঠিক তেমনই। এইসব বাড়তি লোকের কোনও আদরও নেই, আবার অনাদরও নেই। আছে, থাকে, এইমাত্র। এই বিধবা দিদিটি থাকে একখানা মাটির ঘরে। নিঃসন্তান, একা। সকালের দিকে বনানী তার ঘরে হানা দেয়।

ও লক্ষ্মীপিসি, কী করছো গো?

লক্ষ্মীপিসি এ সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আসন পেতে বসে মালা জপেন। সাড়া দেন না। বনানী বালতিতে গোবর গুলে দাওয়াটা নিকিয়ে দেয়। উঠোন ঝেঁটিয়ে দেয়। দাওয়ার কোলে লক্ষ্মীপিসির বেড়াঘেরা রান্নাঘরে গিয়ে কাঠের উনুনে জ্বাল তুলে সসপ্যানে চায়ের জল বসায়।

চা যে-ই হয়ে যায় লক্ষ্মীপিসির মালার জপও সেই শেষ হয়।

তারপর দুজনে দুটো কাঁসার গেলাসে চা নিয়ে বসে দাওয়ায়। বেশ গল্পটল্প হয় তাদের। তবে মেয়েমানুষের কথাই বা কী, কুটকচালি ছাড়া। লক্ষ্মীপিসি বসে বসে সংসারের নানাজনের নানা কথা খানিক বাড়িয়ে খানিক রাঙিয়ে, কখনও বা বানিয়ে বলতে থাকে। আর বনানী হুঁ হাঁ করে যায়। কোটনামি করলেও লক্ষ্মীপিসি লোকটা তেমন খারাপ নয়। তাঁর একখানা গুণ হচ্ছে, অসাধারণ সেলাইয়ের হাত। সেলাই আর বোনা দেখলে চোখ

জুড়িয়ে যায়। সেলাই করে আর সোয়েটার বা লেস বুনে তাঁর কিছু আয় হয়। সুতরাং লক্ষ্মীপিসি একেবারে ফ্যালনাও নয়, গলগ্রহও নয়। মাঝে মাঝে পিসি বলেন, আমার যা আছে সব তোকে দিয়ে যাবো।

বনানী একথাটা ভাল বোঝে না। লক্ষ্মীপিসিরটা সে পাবে কেন? পিসির তো অনেক আপনজন আছে। সে অবাক হয়ে বলে, আমাকে দেবে কেন পিসি? তোমার তো মদন আছে, ফুলু আছে, মণিপান্তি আছে।

আছে! সারাদিনে একবার খোঁজ নিতে দেখিস? এই যা সকালে এসে তুই-ই একটু খোঁজখবর করিস। তোকেই সব দেবো আমি। তুই ভাল করে ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাবি।

এ কথাটায় একটু শিহরিত হয় বনানী। ডাক্তাররা তার কাছে যাদুকর, ভগবান। ওষুধ হল অমৃতস্বরূপ। সে জানে একজন ভাল ডাক্তার যদি তাকে দেখে ওষুধ দেয় তবে তার এই রোগভোগা শরীরে রক্তের বান ডাকবে। মণিপান্তিরা যেমন বুক ফুলিয়ে ডগমগ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, সেরকম ঘুরে বেড়াতে পারবে সেও। একবার এক ডাক্তারই না তাকে ফিরিয়ে এনেছিল মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে! কিন্তু এই জীবনে ডাক্তার দেখানোর কথা বনানী ভাবতেই পারে না। কত টাকা খরচ হয় ডাক্তার দেখাতে!

চুরি করে একবার হেলথ সেন্টারে গিয়েছিল সে। আগের ডাক্তারটি আর নেই। নতুন একজন গোমরামুখো ডাক্তার তাকে বিশেষ পাত্তা দিল না। ঘায়ের জন্য একটু মলম দিল, ব্যস। আর একটা কাগজে কী একটু লিখে দিয়ে বলেছিল, এটা জোগাড় করতে পারলে খাস।

কাগজটা এখনও যত্ন করে রেখে দিয়েছে বনানী। একবার বাবাকে দেখিয়েওছিল। বাবা উদাস হয়ে বলল, তোকে বাঁচাবে কে বল। মরতেই জন্মেছিস।

মরতেই যে তার জন্ম এটা বনানী খুব ভাল করে জানে। বেঁচে থাকতে পারে তারাই যাদের বেঁচে থাকাটা অন্য কেউ চায়। যাদের ভালবাসার লোক আছে। বনানীর তো সেরকম কেউ নেই। কে চাইবে যে সে বেঁচে থাকুক?

আর এই রোগা ঝলঝলে শরীর এটা নিয়েই বা কি করে সে বেঁচে থাকবে তা বোঝে না বনানী। বড্ড অসাড়, বড্ড ঠাণ্ডা তার শরীর। বর্ষায়, শীতে গাঁটে গাঁটে একরকম ব্যথা শেয়ালের কামড়ের মতো তার হাড়গোড় চিবোয়। এক এক সময়ে শোয়া থেকে উঠতে পারে না কিছুতেই শত চেষ্টাতেও। জেগে থেকেও এক এক সময়ে তার মনে হয়, মরে গেছে বুঝি!

বনানী অ আ ক খ শিখেছিল সেই কবে। বাবা তখন মা-মরা মেয়েকে কোলে নিয়ে বুকে মাথা চেপে ধরে কত আদর করে শেখাতো। পাঠশালাতেও ভর্তি হয়েছিল সে। তারপর মাসী এল। একটা ঝড় যেন সব উল্টে-পাল্টে দিয়ে গেল।

দাসশর্মাদের বাড়িতে বনানী কেমন আছে? বেশ আছে, যতদিন থাকা যায়। কিন্তু সে খুব বোকা-বোকা দেখতে হলেও ততটা বোকা নয়। সে টের পায় বশিষ্ঠ দাসশর্মার এই সুখের সংসার খুব বেশি দিন নয়। তারা চার ভাই। অন্য তিন ভাইয়ের সঙ্গে বশিষ্ঠর তেমন বনিবনা হচ্ছে না। চারদিকে একটা গুজগুজ ফুসফুস উঠেছে, বাড়ি ভাগ হবে, হাঁড়ি আলাদা হবে, বিষয় সম্পত্তির বাঁটোয়ারাও হবে সেই সঙ্গে। ক'দিন হল শহর থেকে উকিল আসছে, কানুনগো আসছে।

লক্ষ্মীপিসি মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার ঘরখানা যে কার ভাগে পড়বে। বশিষ্ঠর ভাগে পড়লে রক্ষে। অন্য তিনজনের কেউ হলে ঝাঁটা মেরে তাড়াবে।

এ ভয়টা একটু একটু বনানীও পায়। বাড়ি যখন ভাগ হয় তখন লোকজনও ভাগ হয়। চাকর ঝি মুনীশ জন সব ভাগ হয়। বনানীকে নেবে কে? কেউ কি নেবে? যদি বশিষ্ঠ দাসশর্মা নেয়ও তখন আর এমন বসে কাজে ফাঁকি দিয়ে দিন কাটাতে পারবে কি সে? তখন তো ভাগের সংসারে এত লোক থাকবে না, গা ঢাকা দেওয়াও চলবে না। তখন তাকেও তাড়াবে।

সংসারে কাজেরই আদর বনানী জানে। তার ইচ্ছেও যায়। কিন্তু পারলে তো! শরীরে যে দেয় না।

মাসী বিষ দিয়েছিল বেশ করেছিল। পুরোটা যদি মুখ চেপে ধরে খাইয়ে দিত, আর হেলথ সেন্টারের সেই ডাক্তারবাবুটি যদি ভাল মানুষ না হত তাহলে একরকম বেঁচে যেত বনানী। বিষটা অল্প ছিল বলে আর বাবা বানিয়ে একটা গল্প বলেছিল বলে থানা-পুলিশ হয়নি। সে মরলে কিন্তু হত। মাসীর ফাঁসিই হত হয়তো বা। তাতে বাবাটা বেঁচে যেত।

এ বাড়ির সামনে দিয়েই বাবা সকাল-বিকেল যায় আসে। আগে আগে ওই সময়টায় রাস্তার ধারে তীর্থের কাকের মতো দাঁড়িয়ে থাকত বনানী। বাবাকে দেখলেই আহ্লাদে চিৎকার দিত, বাবা গো!

বাবা খুশি হত কিনা বলা যায় না। তবে মরা চোখে তাকাত। একটু দাঁড়াত সামনে। মাথায় একটু হাত দিত। সে সময়ে বাবার কাঁচাপাকা চুল অল্প সাদাটে দাড়ি, শুকনো মুখ আর জলে-ডোবা চোখ দেখে বড় মায়া হত বনানীর। এই একটা লোক হয়তো চাইত, বনানী বেঁচে থাক।

বাবা এখনও যায় আসে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে গেলে বনানী গিয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়ায়। দুটো কথা বলে। দেখা হয় মুদীর দোকানে বা কয়লার ডিপোয়। একটা দুটোর বেশি কথা বলে না বাবা। কীই বা বলার আছে! এক এক সময়ে কি মানুষের কথা একেবারে ফুরিয়ে যায়? নিজের বাবাকে দেখে সেরকমই মনে হয় বনানীর। তার মা যখন মরে যায় তখন সে ছোট্টটি। চঞ্চল দুরন্ত মেয়ে বলে বাবা পায়খানায় যাওয়ার সময়ও তাকে কোলে করে নিয়ে যেত। পাছে ঘরে রেখে গেলে কোনও বিপদ ঘটায়। সেইসব কথা মনে আছে বনানীর। সেই বাবাই তো তাকে বেড়াল-পার করে দিয়েছে এ-বাড়িতে।

মরবে বনানী। মরতেই তার জন্ম।

উঠোনে লক্ষ্মীর পায়ের মতো জলছাপ ফেলে পুকুরঘাট থেকে কে যেন ঘরে গেছে!

কী ছোট্ট আর কী সুন্দর নিখুঁত সে পায়ের পাতার গড়ন! বনানী চিহ্ন ধরে ধরে এগোয়। জানে এ পা হল বশিষ্ঠর বড় ছেলে শুভবিকাশের নতুন বউ চিনির।

নতুন বউ মাত্রই ভাল। কী যে অদ্ভুত নতুন বউয়ের গায়ের গন্ধ, মুখের লজ্জা-রাঙা ভাব, রসের হাসি। চিনি তাদের মধ্যেও যেন আরও ভাল। দূর-ছাই করে না, হাসিমুখে কথা কয়। তার ঘরের কাছে আজকাল একটু বেশিই ঘুর-ঘুর করে বনানী। হুট করে ঘরে ঢোকে না, অত সাহস তার নেই।

আজও দাওয়ায় উঠে কপাটের আড়াল থেকে দেখছিল বনানী। চিনি জানালার ধারে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কষে সিঁদুর দিচ্ছে সিঁথিতে নতুন বউরা খুব সিঁদুর দিতে ভালবাসে।

চোখে চোখ পড়তেই চিনি হাসল। ডাকল, আয়। ভিতরে আয়।

বনানী ঘরে ঢোকে। দরজার গায়েই দাঁড়িয়ে থাকে।

চিনি ফিরে তাকাল, তোর ঘাগুলো সারে না, না রে?

না।

চুলকোয়?

মাঝে মাঝে চুলকোয়।

ওষুধ দিস না?

না। মাছি বসে বলে শুকোয় না। নইলে—

তোর মাথা। আমার কাছে একটা পেনিসিলিন অয়েন্টমেন্ট আছে, নিবি? লাগিয়ে দেখ তো কয়েকদিন। না শুকোলে বলিস। আমার দাদাকে লিখে দেবো, ওষুধ পাঠিয়ে দেবে। আমার দাদা কলকাতার ডাক্তার।

ডাক্তারদের প্রতি একটা খুব শ্রদ্ধাবোধ আছে বনানীর। চিনি ডাক্তারের বোন জেনে সে খুব ভক্তিভরে চেয়ে রইল।

চিনি উঠে একটা ছোটো বাক্স খুলে নতুন একটা টিউব তার হাতে দিয়ে বলল, ঘা ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে শুকনো করে মুছে লাগাবি।

ঘাড় নেড়ে বনানী বলে, আচ্ছা।

তুই নাকি বামুনের মেয়ে?

হ্যাঁ। চাটুজ্জে।

লেখাপড়া শিখেছিস?

না গো, পাঠশালায় পড়তাম। তারপর আর হয়নি।

একটু-আধটু পড়তে পারিস তো?

যুক্তাক্ষর তেমন পারি না।

বিয়েতে আমি কয়েকটা বই পেয়েছি। সবই বাজে বই। ভাবছিলাম কাকে দিয়ে জঞ্জাল সরাবো। তা তুই দুটো নিয়ে যা। বুঝিস না বুঝিস পড়ার চেষ্টা কর। না পারলে আমাকে জিজ্ঞেস করে নিস।

নতুন বউ যা বলে সবই তার শিরোধার্য মনে হয়। বনানী বই আর ওষুধ এনে তার পাটাতনের আস্তানায় সযত্নে লুকিয়ে রাখল।

এই মরা-মরা জীবনেও মাঝে মাঝে এরকম ঘটলে একটু কেমন বাঁচার ইচ্ছে জাগে। বই বা ওষুধ, ওগুলো কিছু নয়। আসল হল ওই আদর-কাড়া কথা। প্রাণটা নিংড়ে যেন জল বের করে আনে চোখ দিয়ে। এটুকু, খুব এইটুকু আদর পেলেও বনানীর মনে হয় অনেকখানি পেয়ে গেল সে। আর বুঝি কিছু চাওয়ার নেই।

চিনি আর একদিন বলল, মাথা সব সময় ন্যাড়া করিস কেন?

ঘা যে!

ঘা সারিয়ে ফেল তাড়াতাড়ি। তোর খুব ঘেঁষ চুল। অত চুল আমার মাথায় নেই। চুল হলে তোকে বেশ দেখাবে।

ওম্মা গো। বনানী লজ্জায় মুখ ঢাকে। সে বলে আধমড়া, তাকে চুল দেখাচ্ছে চিনি-বউ! লজ্জাতেই মরে যাবে সে।

আশ্চর্য! অয়েন্টমেন্টে বেশ কাজ দিতে লাগল। কয়েকদিন খুব যত্ন করে লাগিয়েছিল বনানী। ঘায়ে টান ধরল। মামড়ি খসতে লাগল। কালো হয়ে এল দগদগে ঘায়ের মুখ।

যুক্তাক্ষর বিশেষ ছিল না বলে একটা বই টানা পড়ে শেষ করে ফেলল বনানী। ছোটোদের জন্য সহজ করে লেখা বঙ্কিমের রাজসিংহ। কী সুন্দর যে গল্পটা। বনানী আবার পড়ল।

পড়ে খুবই অবাক হয়ে গেল বনানী। একটা বাঁধানো বই যে সে আগাগোড়া পড়ে উঠতে পারবে এ তার ধারণার বাইরে ছিল।

শুধু বেঁচে থাকতে পারলে, কোনওরকমে কেবলমাত্র বেঁচে থাকতে পারলেও জীবনে কত কী যে হয়!

হেদুয়ায় এলে অলক একবার দাদুর বাড়ি হানা না দিয়ে যায় না।

বাপ আর ছেলের মধ্যে যেমন জেনারেশন গ্যাপ থাকে, দাদু আর নাতির মধ্যে তেমনটা না থাকতেও পারে। বাপ আর ছেলে সব সময়েই সরাসরি সংঘর্ষের সম্ভাবনার মধ্যে থাকে। দাদু আর নাতির সেই ভয় নেই। প্রজন্মগত পার্থক্যটা বেশি হওয়ার দরুনই বোধহয় তাদের মধ্যে এক সমঝোতা গড়ে ওঠে।

অলকের দাদু সৌরীন্দ্রমোহন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট ছিলেন। সে আমলে তাঁর পেশায় তেমন পয়সা ছিল না। তবু সৌরীন্দ্রমোহন কিছু টাকা করতে পেরেছিলেন সিনেমা থিয়েটারে কাজ করে এবং একটা ফোটোগ্রাফির স্টুডিও চালিয়ে। স্টুডিও বেচে দিয়েছেন, এখন আর আঁকেন না। বয়স পঁচাত্তর। তিন ছেলে এবং এক মেয়ের বাবা। সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের বাড়িটা কিনেছিলেন পঁয়তাল্লিশ সালে। সেই বাড়ি নিয়েই ছেলেদের সঙ্গে বখেরা।

সৌরীন্দ্রমোহনের মেয়ে সোনালীর বিয়ে হয়নি। সোনালী দেখতে ভাল নয়, উপরন্তু তার পিঠে একটা কুঁজ থাকায় বিয়ে বা সংসারের স্বপ্ন সে ছেলেবেলা থেকেই দেখে না। সৌরীন্দ্রমোহন মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে বাড়িটা তার নামে লিখে দেন এবং নিজের টাকাপয়সার সিংহ ভাগটাই তার নামে ব্যাঙ্কে জমা করেন। ছেলেরা গর্জে উঠল, আপনি কি ভাবেন সোনালীকে আমরা দেখব না?

এই ঝগড়া দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তবে ছেলেরা লায়েক হয়ে যে যার আলাদা এস্টাবলিশমেন্ট করে চলে গেছে। এমনিতেও আজকাল পৈতৃক বাড়িতে ছেলেরা থাকতে চায় না। সৌরীন্দ্রমোহন জানেন, তার ছেলেরাও আলাদা হতই, সোনালী উপলক্ষ মাত্র।

সুতরাং উত্তর কলকাতার এই বাড়িতে সৌরীন্দ্রমোহন, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে মোট এই তিনটি প্রাণী। ছেলে বা নাতি-নাতনীরা কেউই আসে না। সম্পর্ক একরকম চুকেবুকে গেছে।

এই পুরনো নোনাধরা প্রকৃতিহীন বাড়ি এবং তার অভ্যন্তরের তিনটি প্রাণীর প্রতি অলকের এক ধরনের টান আছে। হেদুয়ায় যখনই তার সাঁতার থাকে তখনই সে একবার দাদু আর ঠানুর কাছে হানা দেয়।

সৌরীন্দ্রমোহন তাঁর এই গম্ভীর ও ঠাণ্ডা প্রকৃতির নাতিটার ওপর এক প্রগাঢ় মায়া অনুভব করেন। ছেলেদের ওপর থেকে যে স্নেহ প্রত্যাহার করার নিষ্ফল চেষ্টায় ভিতরে ভিতরে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলেন তা এই একটি অবলম্বন পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তবে তাঁর প্রকৃতি গম্ভীর বলে বাইরে তেমন প্রকাশ নেই।

সৌরীন্দ্রমোহনের স্ত্রী বনলতা একটু সেকেলে। নাতির তিনি আর কিছু বুঝুন না বুঝুন, শুধু এটুকু বোঝেন যে, ছেলেটা নিজেদের বাড়িতে তেমন ভাল-মন্দ খেতে পায় না। বনলতা একটু ঠোঁটকাটাও বটে। কথায় কথায় তিনি মনীষার উল্লেখ করেন "নাচনেওয়ালী" বলে। তাঁর ধারণা, নাচনেওয়ালীর কি আর সংসারে মন আছে? সে কেবল নেচে আর নাচিয়ে বেড়ায়। বনলতার দৃষ্টিভঙ্গি পুরনো আমলের বলেই তাঁর মূল্যবোধ অন্যরকম। তাঁর মতে গুছিয়ে সংসার করা, ভাল-মন্দ রাঁধা এবং পুরুষের ওপর নির্ভরশীল হওয়াই মেয়েদের ধর্ম। সেই বিচারে মনীষা একেবারেই ধোপে টেঁকে না। বাস্তবিকই মনীষা রান্নাবান্না বা খাওয়া-দাওয়াকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। অনেক সময়ে দোকানের খাবার আনিয়ে এক-আধবেলা চালিয়ে নেয়। রান্নাঘরে বাঁধা পড়লে তো তার চলবে না। বনলতা তাই নাতি এলেই খাবার করতে বসেন এবং পেট পুরে খাওয়ান তাকে। অলক বিনাবাক্যে খেয়েও নেয়।

পিসি সোনালী ইংরিজির এম.এ। শারীরিক ত্রুটির ফলেই কি না কে জানে তার মেজাজ সাঙ্ঘাতিক তিরিক্ষি। মা-বাপকে সে রীতিমত শাসনে রাখে। একটু কিছু হলেই সে রেগে আটখানা হয়, নয়তো কাঁদতে বসে। স্থৈর্য, ধৈর্য, সহনশীলতা তার খুবই কম। কিছুদিন আগে সোনালী একটা স্কুলে চাকরি পেয়েছে। সময়টা কাটে ভাল। কিন্তু তার একটাই অসুবিধে, টাকা খরচ করার মতো যথেষ্ট উপলক্ষ খুঁজে পায় না। শাড়ি গয়না ইত্যাদিতে তার আকর্ষণ নেই, সে রূপটান ব্যবহারই করে না। তাহলে একটা মেয়ে খরচ করবে কিসে? অনেক সময়ে প্রিয়জন কাউকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তার প্রিয়জনই বা কে আছে?

অলককে পেয়ে পিসির সেই অভাবটা মিটল। এই ঠাণ্ডা সুস্থির ভাইপোটাকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে দেদার জিনিস কিনে দিয়ে সোনালী প্রায় পাগল করে দিল।

একদিন অলক বিরক্ত হয়ে বলল, আমার জন্য রানিং বুট কিনেছো কেন? রানিং বুট দিয়ে আমার কী হবে?

বিস্মিত সোনালী বলে, কেন, তুই দৌড়োস না?

দৌড়োবো কেন? আমি তো সাঁতরাই।

সাঁতারুদের দৌড়োতে হয় না বুঝি? আমাকে স্কুলের গেম টিচার বলেছিল সাঁতারুদের দৌড়োতে হয়। একসারসাইজ করতে হয়।

ধুস! ওসব কিছুই লাগে না। ঠিক আছে, কিনেছো যখন, মাঝে-মাঝে দৌড়োবো।

জলে ভাসে এমন একটা দাবার ছক তাকে একদিন কিনে দিল সোনালী। বলল, জলে সাঁতরাতে সাঁতরাতে খেলবি।

অলক দাবার ছকটা দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, এর যে অনেক দাম!

তাতে কি? উদাসভাবে বলল সোনালী।

এছাড়া দামী পোশাক, ভাল জুতো, হাতঘড়ি এসব প্রায়ই কিনে দেয় সোনালী। আর এইসব দেয়া-থোয়া নিয়ে মনীষা গজরাতে থাকে বেহালায়। তার ধারণা, এইভাবে দাদু-ঠাকুমা আর পিসি অলককে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে! তার প্রশ্ন, কেন,আমরা কি ছেলেকে কিছু কম দিই? কিন্তু মনীষা কখনও এমন কথা অলককে বলতে পারে না যে, ওদের কাছ থেকে নিস না। কথাটা বলা যায় না। শত হলেও ওরা অলকের আপন ঠাকুমা-দাদু, আপন পিসি। কথাটা বললে হয়তো অলক তেমন খুশি হবে না।

এ-বাড়িতে সকলেই অলকের প্রিয় বটে, কিন্তু তার আসল আকর্ষণ ঠাকুমা। তার প্রতি ঠাকুমার ভালবাসাটা ক্ষুধার্তের মতো। ভীষণ ঝাঁঝালো, দ্বিধাহীন এবং প্রত্যক্ষ সেই স্নেহ। সে এলে ঠাকুমা কেমন ডগমগ হয়ে ওঠে, অনেক বকে এবং রাজ্যের খাবার করতে বসে যায়। কাছে বসিয়ে অনেক প্রশ্ন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

ঠাকুমার প্রতি অলকের আকর্ষণের আর একটা কারণ হল, জল। সে আবিষ্কার করেছে ঠাকুমাও তার মতই জল ভালবাসে। ঠাকুমা বলে, সুযোগ পেলে আমি কবে আরতি সাহার মতো ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে যেতাম। ···পুরীতে যখন প্রথম সমুদ্র দেখি তখন ভয়ে সবাই অস্থির। আমার একটুও ভয় করল না। নুলিয়া না নিয়েই দিব্যি নেমে পড়লাম জলে।··· ছেলেবেলায় যখন পুকুরে ডুবসাঁতার কাটতাম তখনকার মতো আনন্দ বোধহয় আর কোনও কিছুতেই ছিল না।

ঠাকুমা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে, ওরা তোকে ঠিকমতো খেতে-টেতে দেয়?

দেবে না কেন?

তোর মা রাঁধে আজকাল?

রাঁধে। মাঝে মাঝে।

রান্নার লোক নেই এখন?

মাঝে মাঝে এক-আধজন রাখা হয়। সে কিছুদিন বাদে ঝগড়া করে চলে যায়। ফের কিছুদিন বাদে একজনকে রাখা হয়। এইরকম আর কি!

তোর অফিসের ভাত রেঁধে দিতে পারে?

অলক হাসে, না। আমি তো দুপুরে অফিসের ক্যান্টিনে খেয়ে নিই। তুমি অত খাওয়া-খাওয়া করো কেন?

ঠাকুমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, সাঁতারে যে অনেক দম লাগে। খাওয়ার দিকে নজর না দিলে বাঁচবি নাকি?

দাদু, ঠাকুমা, পিসির সঙ্গে অলকের এই টান-ভালবাসার কথা খুব ডিটেলসে না জানলেও আন্দাজ ধরতে পারে মনীষা। অনুমান করতে পারে তার দিদি মধুরা অর্থাৎ নূপুর এবং বোন প্রিয়াঙ্গি অর্থাৎ ঝুমুর। এবং শোধ নেওয়ার জন্যই বোধহয় একসময়ে মনীষা উঠে-পড়ে অলকের যত্ন নিতে শুরু করে। রোজ ভাল ভাল রাঁধতে থাকে, মেটে চচ্চড়ি, মুর্গির সূপ, টেংরির ঝোল ইত্যাদি। বিনা উপলক্ষেই একটা টু-ইন-ওয়ান উপহার দিয়ে বসে তাকে তার বাবা সত্যকাম। খুব বেশিরকম আদর দেখাতে থাকে ঝুমুর।

তার চেয়েও মারাত্মক কাণ্ড করে বসে নূপুর। রোজ সকালে উঠে সে ভাইয়ের মেডিকেল চেক-আপ শুরু করে দেয়। আর তাই করতে গিয়েই একদিন সে বিকট চেঁচিয়ে ওঠে, মা! বাবা! শিগগির এসো? সবাই যথাবিধি ছুটে এসে জড়ো হয় এবং নূপুর ঘোষণা করে, অলকের হার্ট বড় হয়ে গেছে। হি নিড্‌স্ ইমিডিয়েট মেডিকেল অ্যাটেনশন। সাঁতার বন্ধ।

কথাটা মিথ্যেও নয়। নূপুর নিজেই যখন একজন মস্ত হার্ট স্পেশালিস্টকে দিয়ে পরীক্ষা করাল অলককে তখন তিনিও বললেন, হার্ট বিপজ্জনক রকমের এনলার্জড্। সম্ভবত সার্জারি কেস।

খবর পেয়ে অলকের সাঁতারু বন্ধুরা চলে এল। এলেন কোচ নিজেও। দু'দিন বাদে ন্যাশনাল ওয়াটারপোলো শুরু হবে। অলক বেঙ্গল টিমের অপরিহার্য খেলোয়াড়। কোচের না এসে উপায় কি! তবে এনলার্জড হার্টের কথায় তিনি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, সাঁতারুদের হার্ট তো বড়ই হওয়ার কথা, যেমন হয় লং ডিসট্যান্স রানারদের। যাই হোক আপনারা ভাববেন না। খেলোয়াড়দের আলাদা ডাক্তার আছে, আমি তাঁকে আনাচ্ছি।

তিনি এলেন এবং একটু পরীক্ষা করেই অলককে বিছানা থেকে টেনে তুলে বললেন, যাঃ, জলে নাম গে। কিস্যু হয়নি। তোর কলজে বড় হবে না তো কি পাঁঠার কলজে বড় হবে?

সেই থেকে বাড়ির যত্ন আবার কমে গেল। কিন্তু দুই বাড়ির তাকে নিয়ে এই কমপিটিশনটা মনে রইল অলকের। কিছু বলেনি কখনো, কিন্তু মাঝে মাঝে সে আপনমনে হেসে ফেলে। কিন্তু এই "অসুখ অসুখ" রবে তার একটা ক্ষতিও হল। দিদি নূপুর যেদিন তার হার্ট বড় হয়েছে বলে ঘোষণা করল, সেদিন থেকেই সে ভীষণ অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেছিল। বাঁ বুকে একটা অস্বস্তি এবং সেই সঙ্গে মনের মধ্যে ভয়। সেই অলীক অসুস্থতার মানসিক ধাক্কাটা বড় কম নয়। অসুখ হওয়াটা বড় কথা নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি বড় হল অসুখ-অসুখ ভাবটা। কেন এই শরীর ধারণ তা অনেক ভেবে দেখেছে অলক। ব্যাধিময়, ব্যথাময়, নশ্বর এই শরীর নিয়ে মানুষের কত না ভাবনা। কিন্তু এই শরীরখানা দেওয়া হয়েছে এটাকে দিয়ে কাজে করিয়ে নেওয়ার জন্যই, বসিয়ে রাখা বা আরাম করার জন্য তো নয়।

শরীরের সহনশক্তিরও কোনও সীমা নেই। কিছুকাল আগের একটা ঘটনা। ঝুমুর তার সঙ্গে সাঁতার শিখতে লেক-এ যেত। ফুটফুটে মেয়ে, সাঁতারের পোশাকে তাকে বেশ রমণীয় দেখাত। লেক-এর ধারে-কাছে বদ

ছেলের অভাব নেই। একদিন গুটি পাঁচেক ছেলে ফেরার পথে তাদের পিছু নেয়।

প্রথমটায় টিটকিরি, দুটো-একটা অশ্লীল কথা ও ইঙ্গিতের পর তারা আরও একটু বাড়াবাড়ি শুরু করে দিল। রুখে দাঁড়াল ঝুমুর। তার চেঁচামেচিতে ছেলেগুলো একটুও ভড়কালো না, বরং একজন এসে টপ করে তার হাত ধরে এক পাক ঘুরিয়ে ছেড়ে দিয়ে বলল, বোল রাধা বোল সঙ্গম হোগা কি নেহি—

অলক খুব বেশি কিছু করেনি। সে গিয়ে ছেলেটার হাত ধরে ফেলেছিল। হয়তো সে কিছুই করত না, হয়তো করত। কিন্তু সে কিছু করার আগেই সেই ছেলেগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। সে যে ঝুমুরের দাদা, প্রেমিক নয়, এটা হয়তো তারা আন্দাজ করেনি। ফুটফুটে সুন্দর একটা মেয়ের সঙ্গে একজন শক্ত সমর্থ পুরুষকে দেখেই সম্ভবত তাদের ঈর্ষা হয়ে থাকবে। একটু ছোটো ইন্ধন দরকার ছিল তাদের।

অলক মারতে পারত উল্টে। তার গায়ে যথেষ্ট জোর। কিন্তু সে মারেনি। শুধু ঠেকানোর চেষ্টা করেছিল। ঠোঁট ফাটল, নাক ফাটল, কপাল ফাটল, বুকে পিঠে লাগল শতেক ঘুঁষি ও লাথি। নীরবে সহ্য করে গেল অলক। শুধু এই ফাঁকে ঝুমুর দৌড়ে গিয়ে ক্লাবে খবর দেওয়ায় অলকের বন্ধুরা ছুটে আসে এবং পাল্টি নেয়। কিন্তু সে অন্য গল্প। শুধু এটুকু বলতে হয় যে, সেই কচুয়া ধোলাই থেকে অলক শিখেছিল যে, শরীর অনেক সয়।

দাদাকে ওরকম নির্বিকারভাবে মার খেতে দেখে ঝুমুরের বিস্ময় আর কাটে না। মারপিটের সময় সে একঝলক অলকের দুখানা চোখ দেখতে পেয়েছিল। সেই চোখের বর্ণনা সে বোধহয় কোনওদিনই সঠিক দিতে পারবে না। ভয়হীন, নিরাসক্ত, উদাসীন অথচ উজ্জ্বল সেই চোখ দেখে কে বিশ্বাস করবে যে, কতগুলো ইতর ছেলের হাতে অলক মার খাচ্ছে। তাছাড়া অলকের মুখে এবং চোখে একটা আনন্দের উদ্ভাসও দেখেছিল ঝুমুর।

কথাটা সে কাউকে বলেনি কখনও। কিন্তু অলককে সেই থেকে মনে মনে কেমন যেন ভয় পায় ঝুমুর। তার মনে হয়, দাদা স্বাভাবিক নয়। হয়তো পাগল। সঠিক অর্থে পাগল না হলেও মনোরোগী। আর তা যদি না হয় তো খুব উঁচু থাক-এর কোনও মানুষ।

মেয়েদের সঙ্গে অলকের সম্পর্ক সহজ ও স্বাভাবিক। বিভিন্ন মিট-এ মেয়ে সাঁতারুদের সঙ্গে দেখা হয়, আলাপ বা আড্ডা হয়, ঘনিষ্ঠতা ঘটে। তাছাড়া ফ্যানরা আছে, আছে সাঁতারুদের বোন বা দিদি।

জান্‌কী কেজরিওয়াল ছিল বড়লোকের আহ্লাদী মেয়ে। মোটামুটি ভালই সাঁতরাতো। তাদের ছিল নিজস্ব সুইমিং পুল, একজন ব্যক্তিগত কোচ। এলাহি ব্যাপার। দেখতেও মন্দ ছিল না জানকী। একটু ঢলানী স্বভাব ছিল, এই যা।

সে একটু ঢলেছিল জানকীর দিকে, লোকে বলে। দিল্লিতে একটা ট্রায়ালের ব্যাপার ছিল। জানকী খারিজ হয়ে খুব কান্নাকাটি বাঁধিয়েছিল সেখানে। মায়াবশে একটু সান্ত্বনা দিতে হয়েছিল অলককে। সেই থেকে পরিচয়টা ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়ে যায়। জানকীর বাবার কোম্পানির একটা রেস্ট হাউস আছে হাউজ খাস-এ। জানকী "আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে সুইসাইড করতে ইচ্ছে হচ্ছে, তুমি আমার সঙ্গে চলো" এসব বলতে বলতে একরকম টেনে নিয়ে গেল সেইখানে। জানকীর দুঃখ কী ছিল বলা মুশকিল, তবে একেবারে চূড়ান্ত কাণ্ডটা ঘটানোর আগে অবধি সেই দুঃখ-দুঃখ ভাবটা তার যাচ্ছিল না। সারা রাত দুজনে এক বিছানায় কাটানোর পর সকালে অলক জানকীকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করল, তোমার শরীরের মধ্যে শরীর ছাড়া আর কিছু নেই?

বস্তুত সারা রাত ধরে জানকীর মধ্যে ডুব দিয়ে অলক একটা কিছু খুঁজেছিল। এমন কিছু যা ভোগে ক্লান্তি আনে না, যা কিছুটা দেহাতীত, কিছুটা রহস্যাবৃত। জীবনের প্রথম সঙ্গম তাকে প্রায় কিছুই দিল না।

এরকম কয়েকবার ঘটেছে অলকের। মেয়েদের ব্যাপারে তার আগ্রহ থাকলেও উদ্যম নেই। সে কারও পিছনে ঘোরে না। কিন্তু জুটে যায়। প্রতিবারই সঙ্গম-শেষে এক হাহাকারে ভরে যায় অলক, এক বিতৃষ্ণা ও বিষণ্ণতায় তার শরীর ভেঙে পড়ে, সে কেন অনুভব করে এক পরাজয়ের গ্লানি? এটা কোনও পাপবোধ নয়। সে অনুভব করে কোনও শরীরেরই তেমন গভীরতা নেই যাতে ডুবে যাওয়া যায় আকণ্ঠ। জলের মতো শরীর নেই কেন কোনও মেয়ের?

এক বন্ধুর অ্যারেঞ্জমেন্টে তারা—অর্থাৎ সাঁতারুদের একটা দল সেবার গেল সরকারী লঞ্চে চেপে সুন্দরবনে বেড়াতে। দু-দিনের চমৎকার প্রোগ্রাম। খাও, দাও, জঙ্গল দেখ, গান গাও বা ঘুমোও। আছে আড্ডা, তাস, ড্রিংকস্।

শুধু জলে নামা ছিল বারণ। মোহনার নদী এমনিতেই লবণাক্ত, তার ওপর কুমীর, কামট, হাঙ্গরের অভাব নেই। ডেক-এ দাঁড়িয়ে আদিগন্ত জল আর প্রগাঢ় অরণ্য দেখতে দেখতে কেমন অন্যরকম হয়ে গেল অলক। গভীর জল, গভীর আকাশ, গভীর অরণ্য।

শেষ রাতে একদিন চুপি চুপি উঠে পড়ল অলক। মাঝদরিয়ায় নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে লঞ্চ। চারদিকে শীতের কুয়াশা, নিথর জল, অদূরে অরণ্যের গভীরতা। এক অলৌকিক আবছায়ায় চারিদিক মায়াময়।

ঝাঁপ দিলে জলে শব্দ হবে, তাই একটা দড়ি ধরে ধীরে ধীরে জলে নেমে গেল অলক। কুমীর, হাঙর, যাই থাক জলে সে কখনও ভয় খায় না। শীতের ভোরে ঠাণ্ডা নোনা জল যখন তার শরীরে কামড় বসাল তখনও তেমন খারাপ লাগল না তার। দুহাতে জল টেনে সে নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে লাগল তীর বেগে। কোথায় যাচ্ছে তা জানে না।

জানে না, আবার জানেও। কুয়াশামাখা সেই সমুদ্রগামী বিস্তীর্ণ নদীর মধ্যেই ছিল সেই অলৌকিক। তার জন্যই অপেক্ষায় ছিল। সেই ডাকই শুনে থাকবে নিশি-পাওয়া অলক।

ক্ষয়া এক চাঁদ অলক্ষ্যে অস্তাচল থেকে নামিয়ে দিয়েছিল তার আলোর কিছু যাদু। সেই আলায় কুয়াশায় ঘনীভূত হয়ে উঠল জল থেকে এক অপরূপ উত্থান। অলক তখন লঞ্চ থেকে অনেক দূরে, নিরুদ্দেশ যাত্রায় ভেসে যাচ্ছে আয়াসহীন। হঠাৎ দেখল অদূরে জলের ওপর সোনালী নীল রুপোলী গোলাপী মাখানো এক অপরূপ জলকন্যা। আনমনে ভেসে আছে জলের ওপর। চোখ সুদূরে। এলো সোনারঙের চুল উড়ছে হাওয়ায়।

কয়েক পলক মাত্র। তারপরেই কুয়াশা এসে ঢেকে দিল তাকে। চাঁদ ডুবল।

জলের ওপর স্রোতের বিরুদ্ধে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে ভেসে থাকল অলক। এইজন্যই ভূতগ্রস্তের মতো তার এতদূর আসা? কে ডাকল তাকে? কেন?

খুব ক্লান্ত হাতে পায়ে উজান ঠেলে যখন সে লঞ্চে এসে উঠল তখনও সকলেই ঘুমে। গা মুছে, শুকনো কাপড় পরে আবার কম্বলের তলায় গিয়ে ঢুকল অলক। কিন্তু ঘুম হল না। সারা দিনটাই কেটে গেল আনমনে।

সেই শুরু। কিন্তু শেষ নয়। মাঝে-মধ্যে তাকে দেখেছে অলক। ভোরবেলার নির্জনতায় লেক-এ রোয়িং করার সময়। গঙ্গায়। গোপালপুর অন সী-তে। নীল সোনালী রূপালী গোলাপীর এক অদ্ভুত কারুকার্য।

ভুল। অলক জানে ভুল। বিশ শতকের এই ভাঁটিতে কে বিশ্বাস করবে জলকন্যার কথা? জলের বিভ্রম তাকে দেখায় ওই মরীচিকা। সে জানে। তবু দেখে। বারবার দেখে।

চার

আজকাল বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি, কূটকচালি বড্ড বেড়েছে। সারাদিন বাড়িময় শেকল আর ফিতে টেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে কানুনগোর লোক। আর বশিষ্ঠ মাঝে মাঝে বিকট গলায় চেঁচিয়ে জানান দিচ্ছে, পাপ! পাপ!

বনানী শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ পড়ে দুচোখ ভরা জল নিয়ে উঠল। তারপর চিনি-বউয়ের কাছে গিয়ে বলল, যুক্তাক্ষর শেখাবে আমাকে?

চিনি-বউ ঠোঁট টিপে হেসে বলল, শিখেই তো গেছিস। একটা আদর্শলিপি নিয়ে আসিস, দেখিয়ে দেবো। খুব যে বই-পড়ার নেশা হয়েছে তোর!

কী ভালই যে লাগে!

বাড়িতে বড় অশান্তি চলছে। চেঁচামেচির কামাই নেই। বিশাল সংসার, অনেক বাসন-কোসন, সোনাদানা, অনেক জিনিস। ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে কথায় কথায় লেগে যাচ্ছে ভাইয়ে ভাইয়ে, বউতে বউতে। এমন কি ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত বাদ নেই।

বনানীর একটা চমকা ভয় ধরে আজকাল। কী যে হবে! কোথায় যে যাবে!

লক্ষ্মীপিসিরও মেজাজ ভাল নয়। প্রায়ই বলে, আগুন লাগল। এখন দেখ, কতদূর পোড়া যায়।

আমার কী হবে পিসি?

তোর তো সুখের জীবন। এক আঘাটা থেকে আর এক আঘাটায় গিয়ে উঠবি। তোর আর কী! বিপদ হল আমাদের, যাদের ঘটিবাটি আগলে দিন কাটে। সংসার যে কী নরক রে বাবা!

বর্ধমানে কী কাজে গিয়েছিল চিনি-বউয়ের দাদা। ফেরার সময় ইচ্ছে হল বোনের শ্বশুরবাড়িটা দেখে যেতে। তাই এসে হাজির এক শীতের সকালবেলায়।

চিনি-বউয়ের ঘরে চা গেল, চিঁড়েভাজা গেল, নারকোল কোড়া গেল, ডিমসেদ্ধ গেল।

বনানীরও খুব ইচ্ছে হল যেতে। ডাক্তার মানুষ, যদি একটু তাকেও দেখে।

প্রথমটায় সাহস হল না। আজকাল তার ঘা নেই, ন্যাড়া মাথায় তিন মাসের চুল গজিয়েছে। চিনি-বউ মিথ্যে বলেনি। তার আর কিছু না থাক, চুলের ঘেঁষটা ভাল।

একটা বেড়াল তাড়ানোর ভান করে অবশেষে গেলও বনানী। লোভ সামলাতে পারল না।

চিনি-বউয়ের দাদা ছেলেমানুষ। ডাক্তার বলে মনেই হয় না। একটা কাঠের চেয়ারে বসে সিগারেট খেতে খেতে বোনের সঙ্গে খুব কথা কইছে।

বনানীকে দেখে চিনি-বউ বলল, আয়, ভিতরে আয়। এই দেখ আমার দাদা।

দাদা বলতে চিনি-বউয়ের চোখে অহংকার ফুটল বেশ।

ঝলঝলে মরা শরীরটা নিয়ে বনানী চিনি-বউয়ের ডাক্তার দাদার সামনে দাঁড়াল। দরজা ঘেঁষেই।

মেয়েটা কে রে?

ও হচ্ছে বামুনের মেয়ে।

চিনি-বউয়ের দাদা একথা শুনে খুব হাসল। তারপর বলল, ওটা কারও পরিচয় হল নাকি? বামুনের মেয়ে না কায়েতের মেয়ে তাই বুঝি জানতে চাইছি?

চিনি-বউ লজ্জা পেয়ে জিভ কাটল। তারপর বলল, ওর নাম হল বনানী। বাপটা মাতাল, সৎমা দুচোখে দেখতে পারে না। এ বাড়িতে কুকুর বেড়ালের মতো পড়ে থাকে। চেহারাটা তো দেখছিস। পনেরো বছর বয়স কেউ বলবে?

পনেরো বছর কথাটা বনানীর নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না। কিন্তু হিসেব করলে তাই দাঁড়ায়। তেরো বছর বয়সে এসেছিল এ বাড়িতে। পনেরোর বেশীই হবে এখন। আজও ঋতুমতী হয়নি। মেয়েমানুষ বলে বোঝাও যায় না তাকে।

চিনি-বউয়ের দাদা তখন ডাক্তারের চোখে দেখল তাকে খানিকক্ষণ। তারপর বলল, ম্যালনিউট্রিশনটাই প্রধান। টনসিল আছে বলে মনে হচ্ছে। এই তুই এদিকে আয় তো!

বনানীর বুকের মধ্যে আশা, ভরসা, আনন্দ ঠেলাঠেলি করতে লাগল। ডাক্তাররা তো প্রায় ভগবান!

পরে সে জেনেছিল, চিনি-বউয়ের দাদার নাম শুভ্র। শুভ্র দাস। সেদিন তার বুক পিঠে চোঙা ঠেকিয়ে, চোখের পাতা টেনে, পেট টিপে অনেক কিছু দেখেছিল। মাথা নেড়ে বলল, তেমন কিছু সিরিয়াস বলে মনে হচ্ছে না। তবে ব্লাড আর ইউরিনটা দেখলে বোঝা যেত।

ওই পর্যন্ত হয়ে রইল সেদিন। একজন ডাক্তার তাকে দেখল, কিন্তু কেমন ভাসা ভাসা ভাবে। কোনও নিদান দিল না।

দাসশর্মাদের বাড়িতে তুলকালাম লাগল এর কিছুদিন পর থেকেই। ভাগাভাগি, টানাটানি, চিল-চেঁচানি, মারপিটের উপক্রম হল কতবার। অবশেষে উঠোনে তিনটে আজগুবি বেড়া উঠল। মুখ দেখাদেখি বন্ধ হল।

বনানী পড়ল বশিষ্ঠর ভাগেই। ছোটো ভাই কেষ্টর ভাগে পড়ল লক্ষ্মীপিসি। লক্ষ্মীমন্ত একটা সংসারের এমন ছিরি হল ক'দিনের মধ্যেই যে, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

লাকড়িঘরের পাটাতনের ঠাঁইটুকু বনানীর রয়ে গেল ঠিকই, কিন্তু খাটুনি বাড়ল বেদম। তার ওপর অবস্থা পড়ে যাওয়ায় বশিষ্ঠর গিন্নি কালী ঠাকরুণ রোজ বলা শুরু করল, ওই অলক্ষুনেটাকে তাড়াও। বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে কে? আর কি আমাদের সেই অবস্থা আছে?

ভয়ে বনানী নিজে থেকেই খাওয়া কমাল। শরীরে যতদূর দেয় ততদূর বা শরীর নিংড়ে তার চেয়েও বেশী খাটতে লাগল। ধান আছড়ানো অবধি বাদ দিল না।

চিনি-বউ বলল, তুই এখানে টিকতে পারবি না। আমিও বরের কাছে বর্ধমানে চলে যাচ্ছি। তুইও পালা।

কোথায় পালাবো? আমার যে যাওয়ার জায়গা নেই।

চিনি-বউ একটু ভেবে বলল, আচ্ছা দাঁড়া। রোববার দাদা আসবে। একবার পরামর্শ করি দাদার সঙ্গে।

শুভ্র দাস রোববারে এল এবং চিনি-বউয়ের সঙ্গে তার কথাও হল।

বনানী দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করছিল উঠোনে।

অবশেষে চিনি-বউ ডাকল। আর সেইদিনই শুভ্রদাদার সঙ্গে বনানী চলে এল কলকাতায়। ঝি-গিরি করতে।

বাবাকে বলে এসেছিল রওনা হওয়ার আগে।

বাবা উদাস মুখে বলল, তুই তো মরতেই জন্মেছিস। যা গিয়ে দেখ। বাবুটি কি ডাক্তার?

হ্যাঁ গো বাবা, বড় ডাক্তার।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তোর চিকিচ্ছে করবে?

করতে পারে।

বশিষ্ঠ তোকে রাখবে না, আমাকেও বলেছে। এ বরং ভালই হল।

ভাল হয়েছিল কিনা কে জানে। বাবার জ্যোতিহীন চোখ, পাঁশুটে ক্ষয়া মুখখানা ভাবতে ভাবতেই সে শুভ্রবাবুর সঙ্গে গাঁ ছেড়ে কলকাতায় এল। খুপরি খুপরি তিন-চারখানা ঘর নিয়ে বাসা। ভারী কষ্ট এখানে মানুষের। সবচেয়ে বড় কষ্ট বোধহয় ছোট্টো জায়গার মধ্যে নিজেকে আঁটিয়ে নেওয়া।

তবু তা একরকম সয়ে নেওয়া যায়। সিঁড়ির তলায় সেই চটের বিছানা, কলঘরে স্নান, ছাদে উঠে কাপড় শুকোনো এসব অভ্যাস করে নিতে সময় লাগত না। কিন্তু ততটা সময় দিল কই শুভ্রবাবুর বউ কল্যাণী? কল্যাণী বউদি প্রথম দিনই বলে ফেলেছিল এ তো টি বি রুগী, কোত্থেকে ধরে আনলে?

নাক সিঁটকে সেই ঘেন্নার চাউনি কি সহজে ভোলা যায়? বনানী সিঁটিয়ে গেল সেই চোখের সামনে। শরীর নিয়ে তার নিজেরই লজ্জার শেষ নেই। তাতে আবার মুখের ওপর খোঁটা।

দিন সাতেকের মাথায় তাকে নিয়ে শুভ্র আর কল্যাণীর মধ্যে বেশ মন কষাকষি বেঁধে গেল। বাড়িতে আরও লোক ছিল। শুভ্রবাবুর বাবা আর মা। বনানীর ব্যাপারে তারাও খুশি নয়।

মুশকিলে পড়ল শুভ্র। বনানীকে ফের চাঁপারহাটে রেখে আসতে হবে। আর বনানীর সমস্যা হল, চাঁপারহাট গিয়ে সে ফের উঠবে কোথায়? তার যে সেখানে আর জায়গা নেই।

ঠিক এইসময়ে শুভ্র একদিন পাশের বাড়িতে বনানীকে নিয়ে তার সমস্যার কথা গল্প করেছিল। সে-বাড়িতে একটি আইবুড়ো মেয়ে আছে, ভারী খেয়ালী। সে বলল, রোগ-টোগ যদি না থাকে তবে আমাদের বাড়িতে

দিতে পারো। মা-বাবার একজন সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়। তবে রোগ থাকলে দিও না।

বনানীর বাস উঠল আবার। ঠেক থেকে ঠেক ঘুরে ঘুরে তার মনের মধ্যে এখন জন্তুর মতো একটা ভয় দেখা দিয়েছে। শুধু বেঁচে থাকাটাই যে এ দুনিয়ায় কী কঠিন ব্যাপার! মাথার ওপর একটু ঢাকনা, দুবেলা দুটো বাসিপান্তা যাহোক জুটে যাওয়া, এটাই এক মস্ত প্রাপ্তি তার কাছে। ভগবানকে সে কদাচিৎ ডাকে। তার মনে হয় ভগবান এক মস্ত মানুষ, তার মতো গরীব ভিখিরির ডাকে কান দেবেন না। কিন্তু এইবার শুভ্রবাবুদের বাসার পাট চুকে যাওয়ার সময় সে এক দুপুরে ভগবানকে খুব ডাকল, এবার যে-বাড়ি যাচ্ছি তারা যেন আমায় ঘেন্না না করে হে ভগবান।

পুঁটুলি বগলে নিয়ে সে যখন সৌরীন্দ্রমোহনের বাড়িতে ঢুকল তখন প্রথম দর্শনেই বাড়িটা তার ভাল লেগে গেল। কম লোক, ঠাণ্ডা শব্দহীন সব ঘর, বেশ নিরিবিলি। বুড়ো-বুড়ি আর তাদের আইবুড়ো একটা মেয়ে। বড় ভয় করছিল বনানীর। তাকে এরা পছন্দ করবে তো! যদি না করে তাহলে সে কোথায় যাবে এর পর?

পিঠে কুঁজওয়ালা মেয়েটাকে দেখে বুক শুকিয়ে গেল বনানীর। চোখে খর দৃষ্টি, মুখটা থমথমে গম্ভীর, কেমন যেন।

সোনালী তখন সবে স্কুল থেকে ফিরেছে। মেজাজটি কিছু গরম। বেশ ঝাঁঝের গলায় বলল, যদি তোর গলা কেটে ফেলি তাহলে টুঁ শব্দ করবি?

বনানী এর জবাবে কী বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, না।

যদি চিমটি কাটি তাহলে চেঁচাবি?

বনানী ভয়ে ভয়ে বলল, না তো!

যদি কাতুকুতু দিই তাহলে কখনও হাসবি?

বনানীর মাথা গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল। গায়ে ঘাম দিচ্ছে। কী পাগলের পাল্লাতেই পড়া গেছে। সে ফের মাথা নেড়ে বলল, না।

এ বাড়িতে থাকতে গেলে রোজ পেস্ট আর ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে হবে, রোজ সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে স্নান করতে হবে, নোংরা থাকলে কাপড়কাচার মুগুর দিয়ে মাথায় মারব, বুঝলি?

হ্যাঁ।

মাথায় ক'হাজার উকুন নিয়ে এসেছিস?

বেশি নয়।

ইস্, বেশি আবার নয়। ওই উলোঝুলো চুলে লাখে লাখে উকুন আছে। মুখে মুখে কথা বলার অভ্যাস নেই তো? চোপা করলে চুলের মুঠি ধরে ছাদে নিয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেবো।

এবার বনানী ততটা ভয় পেল না। তার মনে হল যতখানি তর্জন গর্জন হচ্ছে ততদূর খারাপ এ মেয়েটা নয়। সে হঠাৎ হেসে ফেলে বলল, আচ্ছা?

চুরি করে খাস?

না তো।

পয়সা-টয়সা সরাবি না তো?

না।

সব তাতেই যে সায় দিয়ে যাচ্ছিস। পরে যদি স্বরূপ বেরোয় তখন দেখবি মজা।

থেকে গেল বনানী। এতকাল সে যত বাড়িতে থেকেছে—মোট চারটে, তার মধ্যে এইটে সবচেয়ে ভাল। কুঁজওলা মেয়েটার নাম সোনালী। এ বাড়িতে তারই অখণ্ড দাপট। বুড়োবুড়ি বিশেষ সাতে পাঁচে নেই। সেই সোনালী তাকে একখানা আলাদা ঘর দেখিয়ে দিল। সে ঘরে চৌকি আছে, পাতলা একটা তোষক আছে, একটা বালিশ আর বিছানায় একখানা তাঁতের নক্সী চাদরও। এতখানি বনানী স্বপ্নেও ভাবেনি। তার বিছানার স্মৃতি কেবল চট আর খড়ের। নিজেদের বাড়িতে ছিল মাচান। তাতে একসময়ে একটু বিছানা হয়তো বা ছিল। কিন্তু ঘুমের মধ্যে পেচ্ছাপ করার দোষে মাসী এসে চটের বিছানার ব্যবস্থা করে।

বহুদিন বাদে বনানী ফের বিছানা পেল। সেইসঙ্গে পেল আস্ত একখানা গন্ধ সাবান, এক গোলা বাংলা সাবান, এক শিশি তেল, দু'গজ রিবন, একখানা চিরুনি, টুথব্রাশ আর পেস্ট, ছোট্ট এক কৌটো পাউডার, দুটো নতুন জামা আর একখানা পুরোনো শাড়ি—এইসব। সোনালীপিসি দিতে জানে বটে, এত দেয় যে বনানী দিশেহারা হয়ে যায়। সে বলেই ফেলল, অত দিও না পিসি, আমার অত লাগে না।

এ বাড়িতে পরিষ্কার থাকতে হবে। নোংরা থাকলে চুলের ঝুঁটি ধরে তাড়াব। বাসী কাপড় ছাড়বি, পায়খানায় যেতে জামাকাপড় ছেড়ে যাবি, হাতমুখ সব সময়ে যেন ঝকঝকে পরিষ্কার থাকে। দাঁত ব্রাশ করতে পারিস না?

পারে না। কিন্তু পারল শেষ পর্যন্ত।

ভয় ছিল বিছানায় পেচ্ছাপ নিয়ে। আজকাল আর বিশেষ একটা হয় না। তবু মাঝে মাঝে করে ফেলে। সোনালী টের পেলে কী যে করবে! ভয়ে ভয়ে জল খাওয়া কমিয়ে দিল সে। রাতে শোওয়ার সময় ভগবানকে বলত, দেখো, যেন আজ না হয়।

সারাদিন প্রাণপণে কাজ করত বনানী। কাজ অবশ্য বিশেষ কিছুই নেই। ঠিকে ঝি আছে, ঠিকে রান্নার লোকও আছে। সে শুধু ঘরদোর সাফসুতরো রাখে, ঝাড়পোঁছ করে। দোকানপাট করতে হয়। এ বাড়িতে আলমারি ভর্তি বই, তাক ভর্তি বই। ধুলো ঝাড়তে গিয়ে সে মাঝে মাঝে এক-আধখানা নামিয়ে বসে বসে খানিকটা করে পড়ে নেয়।

ব্যাপারটা একদিন সৌরীন্দ্রমোহনের নজরে পড়ল।

তুই বাংলা পড়তে পারিস?

পারি।

বাঃ। আমার চোখে ছানি বলে পড়তে পারি না। খবরের কাগজটা পড়ে শোনা তো।

সামনের ঝুল-বারান্দায় ইজিচেয়ারে আধশোয়া সৌরীন্দ্রমোহনের পায়ের কাছে বসে বেলা দশটার রোদে খবরের কাগজ পড়া বনানীর এ জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অভিজ্ঞতা। নিচে দিয়ে রিকশা যায়, লোক যায়, চারদিকে ঝকঝক করে শহর, আর সে বসে বসে এক অদ্ভুত পৃথিবীর নানা অদ্ভুত খবর দুলে দুলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে। মানে বোঝে না সবসময়, কিন্তু মনে ছবির পর ছবি ভেসে উঠতে থাকে।

এইরকমই এক সকালে যখন সে সৌরীন্দ্রমোহনকে কাগজ পড়ে শোনাচ্ছে তখন রাস্তা থেকে একটা গমগমে গলার ডাক এল, দাদু!

সৌরীন্দ্রমোহন সোজা হয়ে বসলেন, আনন্দিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আয় অলক, আয়। কেরালা থেকে কবে ফিরলি?

এই তো।

জীবনে যত পুরুষমানুষ দেখেছে বনানী কারও সঙ্গেই এর মিলল না। আসলে পুরুষ আর মেয়েমানুষের তফাৎটাও তেমন করে এ পর্যন্ত মনের মধ্যে উঁকি মারেনি তার। আর সে নিজে? সে পুরুষ না মেয়ে তা নিজের শরীরে এ তাবৎ টের পায়নি সে।

কিন্তু ওই যে লম্বা শক্ত গড়নের অদ্ভুত শান্ত ও অন্যমনস্ক মুখশ্রীর ছেলেটি টকাটক সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এল, একে দেখেই বনানীর ভিতরে যেন ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ল ঘরবাড়ি, গাছপালা দুলতে লাগল ঝড়ে, আকাশে বিদ্যুৎ চমকাল, বাজ পড়তে লাগল উপর্যুপরি।

নিজের রোগ ক্ষয়া শরীরটা এই প্রথম কারও চোখ থেকে আড়াল করার জন্য ছাদে পালিয়ে গেল সে।

অনেক পরে যখন দিদিমার ডাক শুনে নেমে এল তখন সেই ছেলেটি বসে লুচি আর মাংস খাচ্ছে। তার দিকে দৃক্‌পাতও করল না। খেয়ে-দেয়ে চলে গেল।

ও কে গো দিদিমা?

দিদিমা উজ্জ্বল মুখে হেসে একগাদা পুরোনো খবরের কাগজ খুলে পাঁচসাতখানা ছবি তাকে দেখিয়ে বলল, এ হল আমার নাতি। মস্ত সাঁতারু। কত নামডাক। এই দেখ না, কাগজে কত ছবি বেরোয় ওর।

একটা মানুষ এল এবং চলে গেল, কিন্তু সে টেরও পেল না তার এই ক্ষণেকের আবির্ভাব আর একজনকে কিভাবে চূর্ণ করে দিল ভিতরে ভিতরে। জীবনে এই প্রথম বনানী ভয়ংকরভাবে টের পেল যে, সে মেয়ে। প্রথম জানল, শুধু দুটো খাওয়া আর মাথার ওপর একটু ছাদ—এর বেশি আরও কিছু আছে। তার ভিতরে দেখা দিল লজ্জা, রোমাঞ্চ এবং আরও কত কী!

একা ঘরে রাতের বেলায় তার ঘুম আসছিল না। চোখ জ্বালা করছে, বুকের ভিতর ঢিবঢিব, মাথাটা কেমন গরম, গায়ে বারবার কাঁটা দিচ্ছে। বারবার অলকের চেহারাটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

সেই রাত থেকে তার বিছানায় পেচ্ছাপ করা বন্ধ হয়ে গেল। পুরোপুরি। মাত্র এক মাসের মধ্যে ঋতুমতী হল সে। খুবই আশ্চর্য সব ব্যাপার ঘটতে লাগল।

জীর্ণ শরীরটাকে নিয়ে বড় লজ্জা ছিল বনানীর। বেঁচে থাকার তেমন কোনও ইচ্ছাশক্তি কাজ করত না। সে জানত মরার জন্যই তার এই জন্ম। কিন্তু এখন তার ভিতরে এক প্রবল ইচ্ছাশক্তি বাঁধ ভাঙল।

একদিন ঘুম থেকে উঠে ফ্রক পরে সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছিল। হঠাৎ সোনালী এসে দাঁড়াল কাছাকাছি। তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, বাঃ রে মুখপুড়ি, তোকে বেশ দেখাচ্ছে তো! চুরি করে খাচ্ছিস নাকি আজকাল।

বনানী আজকাল ঠাট্টা বোঝে। শুধু হাসল।

সোনালী চোখ পাকিয়ে বলল, ফ্রক পরে বারান্দায় দাঁড়াস কেন ধিঙ্গি মেয়ে? পাড়ার ছোঁড়াগুলো দেখলে সিটি মারবে। যা, বাথরুমে যা।

শুনে বনানীর চোখ কপালে উঠল। তাকে দেখে ছেলেরা সিটি দেবে! তাকে দেখে!

সে দৌড়ে বাথরুমে গিয়ে ঢুকে একা একা হিঃ হিঃ করে পাগলের মতো হাসতে লাগল। মাগো! সোনালী পিসিটা একদম পাগল। একদম পাগল। এ মা! কী বলে রে!

শূক থেকে প্রজাপতির জন্ম যেমন অদ্ভুত তেমনই অদ্ভুত কিছু ঘটতে লাগল বনানীর শরীরেও। ঝলঝলে সেই রোগা শরীরে কোথা থেকে ধীরে ধীরে জমে উঠছিল পলির স্তর, উর্বরতা।

পাঁচ

দাদা, একে চিনিস?

অলক দীর্ঘ ক্লান্তিকর এক ওয়ার্ক আউটের পর সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে সটান শুয়ে পড়েছিল। চোখ জুড়ে আসছিল অবসাদে। ঝুমুরের ডাকে চোখ তুলল। ঝুমুরের সঙ্গে একটি মেয়ে।

না তো!

ও তোর সঙ্গে আলাপ করতে চায়।

অলক ভাল করে তাকিয়ে বুঝল বাজে কথা। মেয়েটির চোখে বিস্ময় বা কৌতূহল নেই। আছে একটু অনিশ্চয়তা, দ্বিধা, সংকোচ। তবে মেয়েটি সুন্দরী। বোধহয় নাচে। বেশ ছমছমে শরীর। হান্ড্রেড পারসেন্ট ফিট।

ও। বসুন।

মেয়েটি বসল না। মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইল।

ঝুমুর বলল, ওর নাম সুছন্দা। দারুণ নাচে।

অলক মেয়েটিকে দেখছিল। দেখার জন্য নয়, বোঝবার জন্য। কিছু কিছু মেয়ে নিশ্চয়ই আছে যারা অলকের সঙ্গে আলাপ করতে চায়, ভাব করতে চায়, প্রেম-ভালবাসা গোছের কিছু করতে চায়। কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখে মনে হয়, এ তাদের দলে নয়। একে ধরে আনা হয়েছে।

অলক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, আমি ভীষণ টায়ার্ড। প্লীজ সুছন্দা, কিছু মনে করবেন না।

সুছন্দা কিছু মনে করল কিনা কে জানে, তবে ঝুমুর ভীষণ অপমান বোধ করে বলে উঠল, ও কী রে দাদা! একটু আলাপ কর। তোকে দেখতেই এল!

অলক মুখ তুলে সুছন্দার দিকে মৃদু হেসে বলল, আপনার সঙ্গে আমার আলাপ জমবে না। একটু পরেই কথা ফুরিয়ে যাবে।

আলাপ করতে একটা টিউনিং দরকার। আমার সঙ্গে আপনার সেই টিউনিং হবে না।

মেয়েটা লাল হল, কাঁদো-কাঁদো হল, তারপর একটিও কথা না বলে চলে গেল।

কী করলি দাদা! ছিঃ! ধমক দিল ঝুমুর।

অলক কথা খুব কম বলে, কিন্তু সুছন্দাকে অত কথা একসঙ্গে বলে সে নিজেই অবাক হয়েছিল। এত কথা তো তার আসে না কখনও। বরং মেয়েটিই একটি কথাও বলেনি।

সুছন্দাকে ভুলে যেতে অলকের বেশি দিন লাগেনি। সারা বছর তার হাজারটা কমপিটিশন, ট্রায়াল, মিট, কোচিং। হাজারটা মুখের সঙ্গে রোজ মুখোমুখি হতে হয়। কত মনে রাখা যায়?

কয়েক মাস আগে লেক-এ একটা ওয়াটার ব্যালের রিহার্সাল চলছিল। অলক জলের ধারে বসে একটা কোল্ড ড্রিংক্স খাচ্ছে আর আলগা চোখে রিহার্সাল দেখছে। এমন সময় ব্যালের গ্রুপ থেকে একটা মেয়ে দল ভেঙে উঠে এসে হেড গিয়ারটা খুলে অলকের দিকে চেয়ে বলল, চিনতে পারছেন?

অলক অবাক হল না। একটু হাসল। বলল, আপনি না নাচতেন?

এখনও নাচি। মনীষাদির কাছে। এ বছর ওয়াটার ব্যালেতেও নেমেছি।

বাঃ বেশ!

বলে অলক আবার কোল্ড ড্রিংকস্‌টা মুখে তুলল।

মেয়েটা তার ভেজা কস্টিউম নিয়েই একটা ফাঁকা চেয়ারে মুখোমুখি বসে বলল, আপনি অত ঠোঁটকাটা কেন?

আমি! বলে অলক খুব ভাবতে লাগল।

মেয়েটি হাসল। বলল, অবশ্য কথাগুলো খুব সত্যি। পরে ভেবে দেখেছি, টিউনিং না থাকলে কথা আসে না।

অলক সংক্ষেপে বলল, হুঁ।

এইভাবে সুছন্দার সঙ্গে আলাপ। আবার আলাপও ঠিক নয়। কারণ অলককে সাঁতার উপলক্ষে দুদিন বাদেই চলে যেতে হল বোম্বাই। ফিরে এসে পনেরো দিনের মাথায় আবার হুবহু একভাবে দেখা হয়ে গেল।

কোথায় গিয়েছিলেন বলুন তো? অনেক দিন দেখিনি আপনাকে।

বোম্বাই।

সাঁতার দিতে?

ওই আর কি।

সুছন্দা হাসল,আপনার সঙ্গে সত্যিই আমার টিউনিং হচ্ছে না।

জবাবে শুধুই একটু হাসল অলক।

আর তিনদিন বাদে আমাদের প্রোগ্রাম। আসবেন?

দেখি যদি থাকি কলকাতায়।

অলক থেকেছিল। ওয়াটার ব্যালেটা উৎরেও গিয়েছিল ভাল। কিন্তু অত রং আর রোশনাইতে একগাদা মেয়ের ভিড়ে সুছন্দাকে সে চিনতেই পারল না।

পরদিন শোওয়ার সময় ঝুমুর রীতিমতো ঝাঁঝাল গলায় বলল, সুছন্দা খুব তোর কথা বলছিল।

ও।

কোথায় আলাপ হল বল তো! লেকে সেই ওয়াটার ব্যালেতে, না?

হুঁ।

কী মেয়ে বাবা!

কথাটা কেন বলল ঝুমুর তা বুঝল না অলক। তবে প্রশ্নও করল না। ঘুমিয়ে পড়ল।

সত্যকাম একদিন রাত্রে ঘোষণা করল, দারুণ প্রডিউসার পেয়ে গেছি মনীষা! স্টোরিও এসে গেছে। ফাটিয়ে দেবো। আই নীড সাম নিউ ফেসেস্। হেলপ করবে?

করব না কেন? কেমন রোল?

হিরোইন।

মনীষা নির্বিকার মুখে বলল, ঝুমুরকে নাও না। মানাবে।

আরে যাঃ। ও হয় না।

তাহলে নূপুর?

তোমার সেই ছাত্রীটি সুছন্দা! ওকে বলে দেখ না।

মনীষা ঠোঁট ওল্টাল। তারপর বলল, সুছন্দাকে খুব পছন্দ দেখছি! কখনও ছেলের বউ করতে চাইছো, কখনও নায়িকা।

শী ফিটস্ দা রিকোয়ারমেন্টস্।

মনীষা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই দেখছি।

সংসারের সম্পর্কগুলো এমন সব সূক্ষ্ম ভারসাম্যতার ওপর নির্ভর করে যে একটা মাছি বসলেও পাল্লা কেৎরে যায়। সুছন্দার প্রতি সত্যকামের এই পক্ষপাত মনীষার সংসারে একটা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারত। কিন্তু মনীষা আর সত্যকামের সম্পর্ক অত সূক্ষ্ম জিনিসের ওপর নির্ভরশীল নয়। বিভিন্ন কারণে তাদের সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে অনেকটাই বোঁদা, ভোঁতা এবং ঈষৎ নিরুত্তাপ। সত্যকামের নারীঘটিত অ্যাডভেঞ্চারের কথা মনীষা জানে বা আঁচ করে। আবার মনীষারও কিছু পরপুরুষের ব্যাপার ছিল, যা হাতেনাতে ধরেও সত্যকাম তেমন কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। সম্ভবত সেগুলো সঞ্চয় করে রেখেছে দরকারমতো কাজে লাগাবে বলে। দুজনের কাছেই দুজনের গুপ্ত কথা সঞ্চিত থাকায় কেউ কাউকে ঘাঁটায় না বিশেষ।

সুতরাং সুছন্দার কাছে প্রস্তাবটা গেল এবং সে ও তার আধুনিক মনোভাবসম্পন্ন সংস্কারমুক্ত মা-বাবা উৎসাহের সঙ্গেই সম্মতি দিল। লোকেশন বাঁকুড়া, কালিম্পং আর হরিদ্বার। তিনমাস শুটিং-এর পর সুছন্দা এতটাই বদলে গেল বা প্রাপ্তবয়স্কা হয়ে উঠল যে চেনা লোকেরাও আর যেন এই অহংকারী, বাচাল, ছলবলে, পাকা ও ন্যাকা মেয়েটাকে চিনে উঠতে পারে না। সেই সিরিয়াস, লাজুক, রোমান্টিক স্বল্পভাষী মেয়েটা সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ।

বিষাক্ত চোখে মনীষা কয়েকদিন নাচের ক্লাশে সুছন্দাকে খুঁজল। পেল না। সুছন্দা পাকাপাকিভাবে তার স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। হন্যে হয়ে ঘুরছে ছবির কন্ট্রাক্ট পাওয়ার জন্য। পার্টি দিচ্ছে ঘন ঘন। বোম্বে ঘুরে এল কয়েকবার।

শীতের শেষ রাতে লেক-এর জলে কোনও সাঁতারুই থাকে না। যারা রোয়িং করে তারাও আসে আর একটু পরে। এই শেষ রাতে আসে শুধু অলক। প্রথম কিছুক্ষণ দুরন্ত দুহাতে বৈঠা মেরে উন্মত্ত গতিতে রোয়িং করে নেয় সে। তারপর কুয়াশায় আধো-আড়াল চারিদিককার এক মোহময়তা ঘনীভূত হতে থাকে জলে। নীল জলে সেই ভোরবেলাকার আবছায়া, কুয়াশা, চাঁদ বা তারা থেকে চুরি-করে-আসা মায়াবী আলোয় তৈরি হতে থাকে প্রিয় বিভ্রম। একসময়ে দীর্ঘ ও সরু, তীরের মতো বেগবান নৌকোটিকে সে থামায়। নিঃশব্দে গ্রিজমাখা শরীরে নেমে যায় জলে।

রোজ নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে এইরকম নির্জনতায়, এমনই বিজনে জল থেকে উঠে আসে জলকন্যা।

সেদিনও অলক দুহাতে জল কেটে শব্দহীন ঘুরে বেড়াচ্ছিল অনির্দিষ্ট লক্ষ্যে। আকস্মিক পিছনে জলের এক মৃদু আলোড়ন টের পেল সে।

অলক জলের মধ্যে লাটিমের মতো একপাক ঘুরল তীর বেগে।

সরু একটা সাদা রোয়িং বোটের মুখ কুয়াশা চিড়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল। তার ওপর জলকন্যা। সাদা, পরীর মতো পোশাক, বৈঠায় দুই গোলাপী হাত।

জলকন্যা?

জলকন্যা মানুষীর গলায় ডাকল, অলক!

বিভ্রম ভেঙে গেল অলকের। কিছুক্ষণ খুবই হতাশ হয়ে চেয়ে রইল সে।

অলক! তোমার সঙ্গে যে ভীষণ দরকার। প্লীজ!

অলক জবাব দিল না। তবে ধীর হস্তক্ষেপে সাঁতরে এসে নিজের নৌকোয় উঠল। কয়েক লহমায় বৈঠা চালিয়ে নৌকো এনে ভিড়িয়ে দিল ক্লাবের ঘাটে, পিছনের দিকে দৃক্‌পাতও না করে ভিতরে ঢুকে ভেজা পোশাক পাল্টে যখন বারান্দায় এল তখন সুছন্দা তার জন্য একটা ফাঁকা টেবিলে অপেক্ষা করছে। শীতের শেষরাতে তার এই অস্বাভাবিক আবির্ভাব নিয়ে অলক কোনও প্রশ্ন করল না বলে কেমন অস্বস্তি বোধ করছিল সুছন্দা।

তবে অলক সুছন্দার দিকে শান্ত, গভীর ও প্রায় অপলক এক জোড়া চোখে চেয়ে রইল।

গত কয়েকমাসে পুরুষের চোখের নানাবিধ চাউনিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সুছন্দা। তবু অলকের ওই নিরুদ্বেগ, ভাষাহীন, প্রশ্নহীন চোখ তাকে লেসার বীমের মতো স্পর্শ করেছিল হয়ত। বারবার সে অস্বস্তিতে মাথা নুইয়ে বা অন্যদিকে চেয়ে এড়াতে চাইছিল সেই চাউনি।

অবশেষে সে বলল, আমি শুনেছিলাম জলের মধ্যে থাকলে নাকি তুমি অন্যরকম হয়ে যাও। আজ দেখলাম সত্যি। মনে হচ্ছিল তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সাঁতরাচ্ছো। অলক একটু হাসল মাত্র। জবাব দিল না। সে জানে একথা বলতে সুছন্দা আসেনি।

সুছন্দা তার কার্ডিগানের দুটো বোতাম খুলল, ফের একটা লাগাল। তারপর নিজের চুলে একটুক্ষণ হাত বুলিয়ে বলল, তুমি আজ সকালের গাড়িতে দিল্লি যাচ্ছো শুনে ভোরবেলা এখানে এসে তোমাকে ধরেছি। আমার ভীষণ বিপদ।

অলক তেমনি এক অকপট চাউনিতে চেয়ে আছে।

সুছন্দা মাথা নুইয়ে বলল,আমার ভীষণ খারাপ সময় যাচ্ছে জানো তো! ভীষণ খারাপ। কেউ আমাকে চাইছে না। বোম্বে কলকাতার কোনও প্রডিউসারই কন্ট্রাক্ট দিচ্ছে না। ঘোরাচ্ছে। অথচ ফিল্ম ক্যারিয়ার ছাড়া আর কিছু আমি ভাবতেও পারছি না।

অলক শান্ত স্বরে বলল, চা খাবে?

খাবো।

অলক চায়ের কথা বলে এসে ফের বসল।

সুছন্দা খুব আকুল গলায় বলল, অলক, প্লীজ আমার একটা উপকার করবে? তোমার বাবা একজন বিগ প্রডিউসার পেয়ে গেছেন। অনেক টাকার প্রোডাকশন। বিগ বাজেট, আমি খবর পেয়েছি একটা ভাল রোল আছে, এখনও কাস্টিং হয়নি।

অলক তেমনি অকপটে চেয়ে থাকল। চা এল, সে একটা চুমুক দিয়ে ফের মুখ তুলল। আবার চেয়ে রইল।

সুছন্দা মুখ নামিয়ে বলল, জানি তুমি কি ভাবছো। তোমার বাবাই আমাকে সিনেমায় নামিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর কাছে আমি নিজেই অ্যাপ্রোচ করতে পারি। কিন্তু তুমি জানো না যে, আমাদের রিলেশনটা ঠিক আগের মতো নেই।

কেন?

সাম থিং হ্যাপেন্‌ড্‌। যদি শুনতে চাও তো বলতে পারি। শুনবে?

যদি বলতে চাও।

হি হ্যাড এ ক্রাশ অন মি। ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন। আমি বাধা দেওয়ায় ক্ষেপে যান।

কথাটা যে মিথ্যে তা সুছন্দার মুখে চোখেই লেখা আছে। অলক অনেকদিন আগেই টের পেয়েছিল, তার বাবা সত্যকাম প্রায় বিনা চেষ্টাতেই সুছন্দাকে যেমন পেতে চেয়েছিল তেমনই পেয়ে গেছে। কিছু বাকি নেই।

অলক কথা না বলে চায়ে দুটো-একটা মৃদু চুমুক দিল।

সুছন্দা চোখভরা জল নিয়ে বলল, তুমি বোধ হয় বিশ্বাস করলে না!

অলক ফের হাসল।

সুছন্দা খানিকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বলল, আচ্ছা স্বীকার করলাম উই হ্যাড অ্যাফেয়ার্স।

অলক খুব ধীরে তার চায়ে আর একবার চুমুক দিল। যখন মুখ তুলল তখন তার উজ্জ্বল মুখ ধূসরতায় মাখা।

সুছন্দা মাথা নিচু করে বসে রইল। চোখ থেকে টপ টপ করে জল ঝরে পড়ছিল টেবিলে। চায়ের কাপেও। সুছন্দা তার রুমালে চোখ মুছল অনেকক্ষণ বাদে। নিজের কপালটা টিপে ধরে বসে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর বলল, উনি আমাকে বিয়ে করতেও চেয়েছিলেন। আমি রাজি হইনি। তারপর নানা খিটিমিটি, আমাদের ঝগড়া হয়ে গেল খুব। তারপর থেকেই রিলেশনটা বিটার। কিন্তু আমি সেটা ভুলে যেতে চাই। আমার অবস্থা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় নেই। তুমি যদি ওঁকে একটু বলো। একটা চান্স। আমি প্রাণপণে করব। তুমি বললেই হবে। তোমার বাবার কাছে তুমি দেবদূত।

অলক উঠল। একটিও কথা না বলে,বিদায় সম্ভাষণ না করে বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে তার স্কুটারে উঠল। স্টার্ট দিল। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলল, বলে দেখব।

মানুষের হীনতার কথা অলক জানে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথাও। মানুষ নিজেকে কতখানি ছোটো হয়ে যেতে দেয় তা সে দেখেনি কি? তাই সত্যকাম বা সুছন্দার ওপর তার ঘৃণা এল না। শুধু তার মনে হল কোনও কার্যকারণ সূত্রে সুছন্দা তার মা হয়। ভাগ্য ভাল, সত্যকাম তাকে ভোগ করার আগে বা পরে অলকের সঙ্গে তার কোনও দৈহিক সম্পর্ক হয়নি।

বাপ-ব্যাটায় বড় একটা দেখা হয় না, কথা হয় না। দিল্লি যাওয়ার আগে অলক একটা ছোট্ট চিরকুট লিখে রেখে গেল সত্যকামের টেবিলে, সুছন্দা কিছু প্রত্যাশা করে। ইন রিটার্ন।

সুছন্দা আবার নামতে পারল সিনেমায়।

কিন্তু ঘটনা সেটা নয়। সুছন্দা বা সত্যকাম কেউ জানল না, এই ঘটনার পর অলক কেমন শুকিয়ে গেল ভিতরে ভিতরে। মেয়েদের সঙ্গে দৈহিক মিলনের সব সুযোগ সে ফিরিয়ে দিতে লাগল এরপর থেকে। ভীষণ ভয় হত তার। বড় সংকোচ।

নূপুর যথারীতি বিয়ে করল এক ডাক্তারকেই। ঝুমুর অনেক নাচিয়ে অবশেষে পাকড়াও করল এক মোটর পার্টসের ব্যবসাদারকে। বাড়ি ফাঁকা হয়ে গেল। সত্যকাম আজকাল প্রায় সবসময়েই বাইরে। মনীষা একা। বড্ড একা। এই ভ্যাকুয়াম কিভাবে ভরে তোলা যায় ভাবতে ভাবতে সে গান আর নাচ নিয়ে পড়ে রইল অহর্নিশি। তারপর তার মনে হল নির্জনতার ভূতটা বাড়ি থেকে যাচ্ছে না।

সুতরাং একদিন মনীষা তার ঠাণ্ডা, মূক ছেলের ওপর চড়াও হয়ে বলল, তুই ভেবেছিসটা কী শুনি?

অলক মায়ের দিকে তেমনি অকপটে চাইল, যেমনটা সে সকলের দিকে চায়।

মনীষা বলল,চাকরি তো ভালই করিস।

অলক একটু হাসল।

কী ঠিক করেছিস, বিয়ে করবি না নাকি? মা-বাপের প্রতি কর্তব্য নেই?

অলক জবাব দিল না।

কিছু বলবি তো? হ্যাঁ কিংবা না!

অলকের মুখে সেই অর্থহীন মৃদু হাসি। চোখে একইরকম অকপট, প্রশ্নহীন, ভাষাহীন চাউনি। মনীষার মনে হয়, তার এই ছেলেটা মাঝে মাঝে সত্যিই বোবা হয়ে যায়। শুধু মুখে বোবা নয়, ওর মনটাও বোবা হয়ে যায় তখন। আর এই সব সময়ে নিজের ছেলের দিকে চাইলে মনীষার বুকের মধ্যে একটা ভয়ের বল লাফাতে থাকে। ধপ ধপ ধপ ধপ। কেবলই মনে হয়, ও একটা ঘষা কাচের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। অস্পষ্ট, আবছা, রহস্যময়।

ছেলের সঙ্গে দূরত্বটাকে সত্যকাম জেনারেশন গ্যাপ বলে মেনেই নিয়েছে। নানা কাজকর্ম এবং ধান্দায়, সর্বোপরি নানা গোপন আনন্দে সে একরকম আলাদা করে নিতে পেরেছে নিজেকে। তার মতে জীবনধারণ এই একবারই। পরজন্ম নেই, কর্মফলটল সব বাজে কথা। ভগবানটান নিয়ে সে কখনও ভাবেনি, তাই মানার প্রশ্নই ওঠে না। আর ওইভাবে নিজের ছেলের সঙ্গেও তার দূরত্বটা হয়েছে নিরেট।

কিন্তু মনীষার তো তা নয়। সত্যি বটে,নূপুর আর ঝুমুরের সঙ্গে তার যে সখিত্ব ছিল, যে সমঝোতা,তার হাজার ভাগের একভাগও অলকের সঙ্গে নেই। কিন্তু সে কখনও হাল ছাড়ে না। মেয়ে দুটো পরের ঘরে চলে যাওয়ায় ফাঁকা বাড়িতে অলককে সে আজকাল অনেক বেশি লক্ষ করে। যত লক্ষ করে তত ভয় বেড়ে যায়।

সত্যকামের রোজগার বাড়ছে, খ্যাতি বাড়ছে, বাড়ছে চারিত্রিক বদনামও। পঞ্চাশ-ছোঁয়া এই বয়সটাও বড় মারাত্মক। ভাঁটির টান যখন লাগে তখন মানুষ ভোগসুখের জন্য পাগল হয়ে যায়। জানে তো আর বেশি সময় হাতে নেই, বেশিদিন আর নয় শরীরের ক্ষমতা। ণত্ব ষত্ব জ্ঞান হারিয়ে তখন সে কেবল খাই-খাই করে খাবলাতে থাকে চারপাশের ভোগ্যবস্তুকে। সত্যকাম চুলে কলপ দিচ্ছে, রংচঙে জামা গায়ে চড়াচ্ছে, সেন্ট মাখছে গায়ে।

মনীষা বিষ-চক্ষুতে নীরবে দেখে যাচ্ছে সব কিছু। দুজনের মধ্যে অসীম ব্যবধান তৈরি হচ্ছে অলক্ষ্যে।

সত্যকাম লাইফ স্টাইল পাল্টাচ্ছে বলে আজকাল সন্ধের পর বাড়িতে থাকলে একটু ড্রিঙ্কস্ নিয়ে বসে এবং মনীষাকেও ডেকে নেয়। স্বামী-স্ত্রী মিলে ড্রিংক করা বেশ একটা নতুন অ্যাডভেঞ্চার মধ্যবিত্ত বাঙালীর কাছে।

মনীষার ব্যাপারটা খারাপও লাগে না। সে অল্পই খায়। সত্যকাম নেশা করে।

একদিন এরকম ড্রিংক করার মুখে সত্যকাম বলল, তোমাকে আজকাল খুব ব্রুডিং মুডে দেখি।

মনীষা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দেখ তাহলে? যাক বাবা বাঁচা গেল।

সামথিং রং?

না। সবই ঠিক আছে।

অলককে নিয়ে কোনও প্রবলেম নয় তো।

মনীষা কেন কে জানে সত্যকামের সঙ্গে অলকের বিষয়ে কথা বলতে ভালবাসে না। তার মনে হয় এ বিষয়ে আলোচনা করার যথার্থ অধিকার সত্যকামের নেই। কেন যে এরকমটা মনে হয় তার ব্যাখ্যা মনীষা কখনও করতে পারবে না।

সে বলল, না না। অলককে নিয়ে প্রবলেম হবে কেন?

অলক প্রবলেম হলেই বা সত্যকামের কী, না হলেই বা কী?

সে তরল আনন্দে ভেসে গেল।

কিন্তু সেই রাতে শোয়ার সময় হঠাৎ সত্যকামের মনে পড়ল, একসময়ে সে সুছন্দার সঙ্গে অলককে ভিড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। এমন কি সুছন্দাকে পুত্রবধূ করার প্রস্তাবও দিয়েছিল সে।

অথচ—

একা একা খুব হাসল সত্যকাম আপনমনে। দুনিয়াটা যে কী হয়ে গেল! ওফ্!

যদি সত্যিই সুছন্দাকে বিয়ে করত অলক? তাহলে কী হত?

মনীষা জিজ্ঞেস করল, ওরকম হাসছো কেন?

খুব নেশা হয়েছে বুঝলে! দুনিয়াটাই অন্যরকম লাগছে।

অন্যরকম লাগানোর জন্যই তো নেশা করো তুমি।

তা ঠিক। তবে এতটাই অন্যরকম হওয়া ঠিক নয়।

অন্যরকম মানে কিরকম তা বুঝিয়ে বলো!

সত্যকাম গম্ভীর হয়ে গেল। আর কিছুই বলল না। সে মনে মনে সুছন্দাকে অলকের পাশে দাঁড় করাল। সুছন্দার মাথায় ঘোমটা, কপালে সিঁদুর। শিউরে উঠে সত্যকাম ছবিটা মুছে ফেলল।

ছয়

বনানীর এক অদ্ভুত সুখকর অস্বস্তি শুরু হল।

সৌরীন্দ্রমোহন, বনলতা, সোনালী সকলেই আজকাল কেমন যেন বিস্ময়ভরে এবং বিমূঢ়ের মতো তার দিকে তাকায়। তারা এমন কিছু দেখে বনানীর মধ্যে যা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

ঠিকে ঝি একদিন বলে উঠল, ও মা, এ যে অশৈলী কাণ্ড গো! সেই পেটমরা মেয়েটা যে একেবারে ধান ফুটে খৈ হল গো।

গয়লা দুধ দিতে এসে হাঁ করে তাকে দেখে। দেখে সৌরীন্দ্রমোহনকে খেউড়ি করতে এসে বিশে নাপিত। দেখে পাড়াপড়শী। প্রত্যেকের চোখেই অবিশ্বাস।

বনানীর আয়না লাগে না। অন্যের চোখেই সে আজকাল নিজেকে দেখতে পায়।

বাস্তবিকই আয়নার দিকে তাকায় না বনানী। কী দেখবে তা নিয়ে তার যত ভয়। সে যে বদলে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু বদলটা কেমন হল তা সে জানতে চায় না।

সোনালী পছন্দ করে না বলে সে পারতপক্ষে বারান্দায় যায় না। নিজেকে সে প্রাণপণে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতেই চেষ্টা করে। তার জীর্ণ শরীরে প্লাবন আসার এই ঘটনা তার কাছে এখনও তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। একা, ঘরে বসে মাঝে মাঝে নিজের স্তনভার অনুভব করতে করতে সে লজ্জায় ঘেমে ওঠে। স্নানঘরে পুরন্ত ঊরু, গভীর নাভি, মসৃণ হাতের গঠন দেখে সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেয়। অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে, ভগবান!

একদিন সোনালী তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এই সর্বনাশী রূপ এতকাল কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলি রে হারমজাদী? তুই যে বহু সংসারে আগুন লাগাবি!

রূপ! রূপের কথা বনানী আজকাল বিশ্বাস করে।

সোনালী ফতোয়া দিল,খবরদার সাজবি না। লোকের সামনে ধিঙ্গির মা সিঙ্গি হয়ে গিয়ে দাঁড়াবি না।

বনানী ম্লান মুখে বলে, কারো সামনে যাই নাকি?

সোনালী বড় বড় চোখে চেয়ে থেকে বলে, মনে কোনও পাপ নেই তো রে মুখপুড়ী? খুব সাবধান কিন্তু!

পাপ! বনানী পাপের কথা ভাবতে গিয়ে বড় অস্থির হয় মনে মনে। একা ঘরে টপ টপ করে চোখের জল পড়ে। পাপ! পাপ কিনা তা তো সে জানে না। কিন্তু ওই যে একজন এসেছিল একদিন, তারপর বহুদিন আর আসেনি, ওই একজন লোক তার জীবনের সব এলোমেলো করে দিল। কেন এল ও? কিছুতেই যে বনানী ওকে মন থেকে, চোখ থেকে মুছে দিতে পারে না!

প্রায় ছ'মাস বাদে আবার বনানী পড়ল ভূমিকম্পে, ঝড়ে, বজ্রপাতে।

দুপুরবেলা। বুড়োবুড়ি ঘুমোচ্ছে। সোনালী ইস্কুলে। এমন সময় কলিং বেল-এর শব্দ।

বনানী ভাবল, পিওন বুঝি। নিচে নেমে দরজা খোলার আগে সে নিয়মমতো জিজ্ঞাসা করল, কে?

আমি। আমি অলক। কে, পিসি নাকি? শিগগির দরজা খোলো, ভীষণ খিদে পেয়েছে।

বনানী দরজা খুলল না। তাড়া-খাওয়া হরিণের মতো ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পায়ে কাপড় জড়িয়ে পড়ে গেল ভীষণ জোরে।

মা গো!

শব্দে বনলতা নেমে এলেন, ও মা! এ কী রে? কী হল তোর?

ওদিকে কলিং বেল বেজে যাচ্ছিল, সঙ্গে অলকের গলা, কী হল ও পিসি?

বনলতা দরজা খুলে দিয়ে বললেন, আয় দাদা, আয়। দেখ তো কী কাণ্ড! মেয়েটা আছাড় খেয়েছে, কী যে করি। হাত পা ভাঙল কিনা।

হাঁটু, গোড়ালি, কনুই, তিন জায়গাতেই প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছিল বনানী। এমন ব্যথা যে তার মুখ নীল হয়ে গিয়েছিল যন্ত্রণায়। তবু অলক ঢুকতেই সে ফের "মা গো" বলে একটা আর্ত চিৎকার করে দুড়দাড় সিঁড়ি ভেঙে নিজের ঘরে এসে বুক চেপে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

সে পারবে না। সে আর বেঁচে থাকতে পারবে না। সে মরে যাবে।

বালিশে মুখ চেপে সে পাগলের মতো কাঁদতে লাগল। পাপ! পাপ! নিশ্চয়ই পাপ? সে যে মরে যাবে।

ঘরে কেউ এল। মাথায় হাত রাখল।

দিদিমার গলা পাওয়া গেল, খুব লেগেছে তোর? দেখি কোথায় লাগল। কাঁদছিস কেন? কাঁদিস না। আমি ডাক্তার ডেকে পাঠাচ্ছি।

না। মাথা নাড়ল বনানী।

একটু বরফ লাগা ব্যথার জায়গায়। ফ্রিজ থেকে এনে দিচ্ছি।

লাগবে না দিদিমা। সেরে গেছে ব্যথা।

দিদিমা অথাৎ বনলতা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, তুই পালিয়ে আসছিলি কেন বল তো! ভয় পেয়েছিলি?

বনানী কী করে বলবে যে, হ্যাঁ ভয়, ভীষণ ভয়।

বনলতা একটু হেসে বললেন, মেয়েমানুষের ভয় থাকা ভাল। হড়াস করে যে দরজা খুলে দিসনি সেটা ভালই করেছিস। অলকের বদলে গুণ্ডা বদমাশও হতে পারত তো।

বনলতা চলে গেলে একা ঘরে বনানী আক্রোশে পা দাপাতে দাপাতে বিড়বিড় করে বলতে লাগল, গুণ্ডাই তো! গুণ্ডা! ডাকাত! কেন এল ও? কেন এল? আমার যে পাপ হচ্ছে! আমার যে ভীষণ পাপ হবে। আমি এখন কী করব? ছাদে উঠে ঝাঁপ দেবো? ফিনাইল খাবো? মুখে কালি মাখবো?

বনানী কিছুই করল না। শুধু কাঁদল। উপুড় হয়ে। অনেকক্ষণ।

তারপর তড়বড় করে উঠে বসল হঠাৎ। ভীষণ অবাক হয়ে ভাবল, আচ্ছা, এই যে আমি ওরকমভাবে পড়ে গেলুম, ব্যথা পেলুম, কাঁদলুম, কই ও তো একবারও এল না আমাকে দেখতে। বাড়ির ঝি বলে কি এতটাই ফেলনা। একটা মানুষ তো। সে ব্যথা পেলে একটু দেখতে আসতে নেই বুঝি?

ভাবতে ভাবতেই আবার বুক ঢিবঢিবিয়ে উঠল তার। মাথা নেড়ে আপনমনে বলল, থাক বাবা। না এসে ভালই হয়েছে। ও এসে সামনে দাঁড়ালে আমার ঠিক হার্ট ফেল হবে।

শরীরের ব্যথা তেমন সত্যিই টের পাচ্ছিল না বনানী। অলক ঘণ্টা দুয়েক থেকে চলে গেল। বিকেল হল। সন্ধের মুখে বনানীর কনুই নীল হয়ে ফুলে উঠল। হাঁটু আর গোড়ালিতেও তাই। অসহ্য টাটানি।

সৌরীন্দ্রমোহন এলেন, বনলতা এলেন, এল সোনালীও।

বনানী কাতর স্বরে বলল, তোমরা যাও-না, আমার কিছু হয়নি।

সোনালী কঠিন গলায় বলল, সেটা আমরা বুঝব। চুপ।

ডাক্তার শুভ্র দাস এসে বনানীকে দেখল। প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে বলল, হ্যাঁ রে বনা, যে মেয়েটাকে বর্ধমানের গাঁ থেকে তুলে এনেছিলাম তুই ঠিক সেই মেয়েটাই তো? তোকে যত দেখি তত আমার অবিশ্বাস হয়। তোর বাবা যদি দেখে তো মূর্ছ যাবে।

সবাই আজকাল এরকম সব কথা বলে বনানীকে। বনানীর সুখ না দুঃখ হয় তা বলতে পারবে না সে। তবে ভারী অস্থির, উত্তেজিত বোধ করে সে।

রাত্রিবেলা ব্যথায় মলম মালিশ করতে এল সোনালী। আঁতকে উঠে বসল বনানী, তুমি কেন? মালিশ আমিই করতে পারব। দাও আমাকে।

সোনালী ধমক দিয়ে বলল, খুব হয়েছে। কনুই ফুলে ঢোল, ওই হাতে উনি মালিশ করবেন!

তা বলে ঝিয়ের পায়ে হাত দেবে? পাপ হবে না আমার?

ঝি! ঝি কোন দুঃখে হতে যাবি? তোকে আমি পুষ্যি নিয়েছি মনে মনে। আজ রাতে আমার সঙ্গে শুবি।

ও মাগো! পারব না। পায়ে পড়ি।

এই কমপ্লেক্স কেন তোর? তোকে তো আমরা ছোটো ভাবি না, তবে তুই কেন ভেবে মারিস? রাত্রে ব্যথা বাড়লে কে দেখবে তোকে?

লজ্জায় মরে গেল বনানী। আর মনে মনে বলল, হে ভগবান, এই বাড়ি থেকে যেন আমাকে কখনও তাড়িও না। এরা বড় ভাল।

তিন-চারদিন পর দুপুরের খাওয়া হয়ে গেলে বনানী চুল শুকোতে গেল ছাদে। রোদ্দুরে পিঠ আর চিলেকোঠার ছায়ায় মুখ রেখে কোলে বই নিয়ে বসে পড়া তার খুব প্রিয়। মাঝে মাঝে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকায়। আকাশে হেমন্তের খণ্ড মেঘ ভেসে ভেসে যায়, চিল ওড়ে, চিলেকোঠার ছাদে বসে কাক ডাকাডাকি করে। ভারী শান্তি পায় সে মনে।

বনানী হঠাৎ শুনতে পেল সিঁড়ি দিয়ে এক জোড়া পায়ের শব্দ উঠে আসছে।

চকিত হল সে। বাড়িতে তারা সাকুল্যে তিনটি প্রাণী এই নির্জন দুপুরে। ছাদে তবে কে আসবে?

সতর্ক হওয়ার বা নিজেকে লুকিয়ে ফেলার সময় পেল না বনানী। হঠাৎ ছাদে এসে দাঁড়াল দীর্ঘ, ছিপছিপে সেই সাঁতারু। একদম মুখোমুখি। সোজা তার চোখে চোখ। ভয়ে বনানী উঠে দাঁড়িয়ে শিউরে কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

বনানী নিশ্চল হয়ে গেল। কিন্তু ভিতরে সেই ঝড়, ভূমিকম্প, বজ্রপাত। চোখ আঠাকাঠিতে আটকানো পাখির মতো লেগে আছে ছেলেটার চোখে।

হঠাৎ ছেলেটা আশ্চর্য এক প্রশ্ন করল, তুমি কে বলো তো?

বনানী জবাব দেওয়ার জন্য নয়, আর্তনাদ করার জন্য হাঁ করেছিল। কিন্তু কোনও শব্দ হল না। বুকে হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে পড়ে যেতে চাইছে ভয়ংকর দোলায়। মাথার মধ্যে অদ্ভুত রেলগাড়ির ঝিক ঝিক শব্দ হচ্ছে।

ছেলেটা তাকিয়ে আছে। স্থির শূন্য একরকম পাগলাটে দৃষ্টি। ফের বলল, কে তুমি? কোত্থেকে এলে? কেন?

বনানীর চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে হল, আমি কেউ না। আমি নেই। আমি কখনও জন্মাইনি। আমাকে ছেড়ে দিন।

পারল না। গলা দিয়ে একটা শব্দও বেরোলো না। ছাদের রেলিঙে ঠেস দিয়ে সে শুধু বোবা চোখে চেয়ে রইল ছেলেটার দিকে।

বললে না তুমি কে? কী চাও?

বনানীর বুকে কথার বুদবুদ ভেসে ওঠে, আমি! আমি কিছুই চাই না। শুধু দুবেলা দু'মুঠো ভাত, মাথার ওপর একটু ঢাকনা···

ছেলেটা এগিয়ে এল কাছে। বনানী উদ্‌ভ্রান্ত, সন্ত্রস্ত, বোবা। তবু লক্ষ করল, ছেলেটার মাথা উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো লাল, মুখখানায় শুকনো ভাব।

ছেলেটা দাঁতে দাঁত চেপে বলল, বলবে না?

বনানী বলল, অনেক কথা বলল সে। কিন্তু কোনও কথাই মুখে এল না। অনুচ্চারিত সেই সব কথা তার বুকে ঘুরতে লাগল অন্ধের মতো। সে বলল, বলছি তো, শুনতে পাচ্ছেন না কেন? আমার গায়ে ঘা ছিল, ন্যাড়া মাথা, রোগাও ছিলুম বড়, বিছানায় পেচ্ছাপ করতুম। চাঁপারহাটের চাটুজ্যেদের মেয়ে আমি। বাবা খুব ভালবাসত আমায়। তার কোলে চেপে বিয়েতে যাই। তারপর কী যে সব হল। বলছি, শুনতে পাচ্ছেন? ছেড়ে দিন, মরি বাঁচি আবার সেখানেই ফিরে যাবো। পাপ কি সয় গো ধর্মে? এ বাড়িতে ঝি-এর বেশি আর কিছু হতে চাইনি তো। পাপ করলে তাড়িয়ে দেবে। তবু পাপ তো হলই। বেশি চেয়ে ফেললুম যে মনে মনে। এবার চলে যাবো। চলে যাবো।

সেই বিশাল পুরুষ যখন আর এক পা এগোলো তখন বনানীর চোখ ভরে টস টস করে নেমে এল জল। মা গো। আর সয় না তো! আর সয় না তো?

চকিতে মনে পড়ল পিছনে রেলিং,তার ওপাশে অবাধ তিন তলার শূন্যতা। একটু দুলিয়ে দিলেই হয় নিজেকে।

আর কী করার ছিল বনানীর? অবোধ, ভাষাহীন ভয়ে আপাদমস্তক অসাড় বনানী নিচু রেলিঙের ওপর দিয়ে নিজেকে ঠেলে দিল পিছনের দিকে। মাগো!

সাত

পক প্রণালীতে একবার একজোড়া বিষাক্ত সামুদ্রিক সাপ তার সঙ্গে অনেকক্ষণ সাঁতার কেটেছিল। অলক ভয় পায়নি। জলে তার কোনও কিছুকেই ভয় নেই। হাঙর, কুমীর,কামট কাউকেই নয়। জলে যদি কোনওদিন তার মৃত্যু হয় তবে সে এক অনন্ত অবগাহনের আহ্লাদ বুকে নিয়ে যাবে।

আজ হেমন্তের এক কুয়াশামাখা সকালে একটি মৃতদেহের মতো চিত হয়ে জলে স্থির ভেসে ছিল অলক। আকাশের রঙ এখনও কুয়াশার সাদা আর আঁধারের কালোয় মাখা ছাইরঙা। আজ তার সেই সাপ দুটোর কথা খুব মনে পড়ছিল। তার দু'পাশে চার-পাঁচ গজের মধ্যেই দুই যমজ ভাইয়ের মতো প্রকাণ্ড সেই সাপ দুটো কিছুক্ষণ পাল্লা টেনেছিল। সামনে গার্ডের নৌকোয় প্রস্তুত ছিল রাইফেল, হারপুন, শার্ক রিপেলন্ট, আরও সব অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু অলক গার্ডদের ডাকেনি। সাপ দুটোকে পাল্লা টানতে দিয়েছিল তার সঙ্গে। ওই সাবলীল গতি, জলের সঙ্গে ওই মিশে থাকা একাত্মতা দুটো সাপের কাছ থেকে শিখে নিচ্ছিল সে। যেমনটা সে বার বার শিখেছে মাছ ও কুমীর, হাঙর বা কামটের কাছেও।

ভয় হল, যখন জল থেকে ডাঙায় উঠল, তখন। অত কাছাকাছি কিছুক্ষণ দুটো মারাত্মক বিষধর সাপ তার সঙ্গে সাঁতার দিয়েছে সে কথা ভেবে গা শিউরে উঠেছিল তার। জলে অলক অন্যরকম, জলের অলক আর ডাঙার অলক যেন দুটো মানুষ।

আজ হেমন্তের সকালে চিত হয়ে স্থির হয়ে জলে ভেসে আকাশের দিকে চেয়ে অলক দুরকম নিজের কথা ভাবল। ভাবল দুটো সাপের কথা। তারপর ভাবনা মুছে গেল মাথা থেকে। মাঝে মাঝে তার সব ঘুমিয়ে পড়ে। মাথা ঘুমোয়, মন ঘুমোয়, দৃষ্টিশক্তি ঘুমোয়।

মা গো!

একটা অদ্ভুত করুণ টানা বাঁশির স্বরের আর্তনাদ শুনে ঘুম ভাঙল অলকের। সে সচকিত হতে গিয়েও হেসে ফেলল।

মেয়েটা কি পাগল? রেলিঙের ওপর যেন ভেজা কাপড়ের মতো নেতিয়ে পড়ল। তারপর···মা গো-ও-ও···! সেই আর্তনাদ কখনও ভুলবে না অলক।

আলো ফুটেছে। অলক ধীরে ধীরে পাড়ে এসে উঠল।

ক্লাবের বারান্দায় আজও বসে আছে সুছন্দা। প্রায়ই থাকে।

অলক গা মুছে পোশাক পরে এসে মুখোমুখি বসল।

সুছন্দা আজও চোখের দিকে তাকাতে পারে না তার। টেবিলে আঁকিবুকি কাটে আঙুল দিয়ে।

অলক!

বলো।

কী ঠিক করলে?

কিছু না।

আমাকে আর কত নির্লজ্জ হতে বলবে তুমি? বিয়ের পর আমি তোমার সঙ্গে যে-কোনও জায়গায় চলে যেতে রাজি আছি। কথা দিচ্ছি কখনও আর সিনেমায় নামব না। সব ছাড়ব, সব ভুলে যাবো।

ডাঙা। ডাঙায় উঠলেই যত জটিলতা, যত কিছু যন্ত্রণা। অলক চুপচাপ বসে রইল সুছন্দার দিকে স্থির চোখে চেয়ে।

সুছন্দার চোখ দিয়ে আজও টস টস করে জল পড়ছিল। মাথা নিচু করে সে বলল, যা হয়ে গেছে তা কি খুব সাংঘাতিক কিছু অলক? ওরকম তো কতই হয়। তোমারও কি হয়নি কোনও মেয়ের সঙ্গে? ভেবে দেখ। সে মেয়ে কি তবে নষ্ট হয়ে গেছে?

অলক একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।

কিছু বলবে না? ভিতরে ভিতরে আমি যে শেষ হয়ে আসছি। এই টেনশন কতদিন সইতে পারব আমি?

স্কুটারে তার পিছনে বসে সুছন্দা খুব নিবিড় করে বেষ্টন করল তাকে।

অলক! প্লীজ, অলক!

বাতাসে আর স্কুটারের শব্দে কথাগুলো উড়ে গেল। অলক শুনল না। যা শুনলেও গা করল না।···

সত্যকাম আজকাল সকালের দিকেই যা খানিকক্ষণ বাড়িতে থাকে। তারপর বোধহয় বেরিয়ে যায়। রাত্রে মাতাল হয়ে ফেরে, ফিরে আরও মাতাল হয়। সকালে যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ মনীষার সঙ্গে তার ঝগড়া হয়। সে ঝগড়া এমনই বে-আব্রু, এমনই নির্লজ্জ যে মনে হয় দুজনেই একটা শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। আর এগোনোর রাস্তা নেই তাদের। একটা নিরেট দেয়ালে ঠেকে গিয়ে তারা অক্ষম মাথা কুটে মরে।

সুছন্দাকে পৌঁছে যখন বাড়ি ফিরল অলক তখন মনীষা আর সত্যকাম রোজকার মতোই ঝগড়া করছে। চেঁচিয়ে নয়, তবে বেশ উঁচু গলায়। সত্যকাম ডিমের পোচ টোস্টে বিছিয়ে নিয়ে খেতে খেতে এবং মনীষা চা করতে করতে।

সত্যকাম বলছে, কেন, তোমার ছেলে সুছন্দাকে বিয়ে করবে না কেন? শী ইজ কোয়াইট অলরাইট। বিউটিফুল, কোয়ায়েট, কোয়ালিফায়েড। এর চেয়ে বেশি কী আশা করো তুমি?

কেন মুখে বলছ ওসব কথা? তোমার লজ্জা করে না? ওই প্রসটার সঙ্গে অলকের বিয়ে দেব আমি? তুমি ভেবেছোটা কী?

ওসব আন্‌ডিগনিফায়েড টার্ম ব্যবহার করছ, তোমারই লজ্জা করা উচিত। আজকাল ক'টা মেয়ে ইনোসেন্ট আছে বলতে পারো? আর ইউ ইওরসেলফ্ ইনোসেন্ট? তোমার দুটো মেয়ের একটাও কি বিয়ের আগে ইনোসেন্ট ছিল? আর তোমার ওই গাছের মতো আকাট ছেলে, তার খবরই বা তুমি কতটুকু রাখো? ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে, বুঝলে?

ইনোসেন্ট নয় সে এক কথা, কিন্তু সুছন্দা ইজ ইনভল্‌ভ্‌ড্ উইথ ইউ। ইভন ইউ স্লিপ উইথ হার।

ঝগড়ার সময় অশ্লীল ইঙ্গিতগুলি দুজনেই ইংরিজি ভাষায় করে। এটা রোজই লক্ষ করছে অলক।

সত্যকাম গলা তুলে বলল, নেভার। কোন শালা ওকথা বলে? আই ট্রিট হার অ্যাজ মাই···মাই···

থাক, আর সাধু সেজো না। কিছুই আমার অজানা নেই।

সত্যকাম ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, আর চতুরলালের সঙ্গে ঝুমুরের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে অত চুলকুনি কেন তোমার সে কি আমি জানি না ভেবেছো? ঝুমুরের চেয়ে ও বিশ বছরের বড়। বাট ইউ জাম্পড অ্যাট দা প্রোপোজাল। চতুরের গাড়িতে করে তুমি কোথায় কোথায় যেতে তার একখানা লগবুক আমার আছে। বেশি সাধ্বী সেজো না।

মনীষার ফোঁপানির শব্দ ওঠে, প্রতিবাদের নয়।

এই সকালে দুটো বিষধর সাপ পরস্পরের ওপর তাদের সমস্ত বিষ উজাড় করে নিঃস্ব হয়। সারা দিন ধরে আবার জমিয়ে তোলে বিষ, আবার ওগড়াবে বলে। একই পদ্ধতি।

অলক টের পায় ওদের আর এগোবার রাস্তা নেই। দেয়ালে ঠেকে গেছে।

হেঁচকি-তোলা ধরা গলায় মনীষা বলে, এত মেয়ে থাকতে সুছন্দাকেই কেন অলকের বউ করতে চাও?

আই অ্যাম গোয়িং টু মেক হার এ বিগ স্টার। কিন্তু মেয়েটা বড্ড বেশি শোয়েয়িং। এর ওর দিকে ঝুঁকে পড়ছে। আজেবাজে প্রডিউসারের পাল্লায় পড়ে যাচ্ছে। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওর ক্যারিয়ার। অথচ শী ইজ ভেরি প্রমিজিং। একটা জায়গায় স্থির না হলে ওর ক্যারিয়ার তৈরি হবে না। তোমার ওই হাঁ-করা বোকা ছেলেটাকে বোধহয় ও ভালবাসে। বিয়ে হলে আমার দুদিকেই সুবিধে। ওকে তৈরি করতে পারব, তোমার ছেলেরও হিল্লে হবে। ইট ইজ নট এ ব্যাড প্রোপোজাল।

অবশেষে মনীষা চুপ করে। সত্যকাম চা খায় এবং হাসিমুখে বেরিয়ে যায়। সে জিতে গেছে।

আজ বহুকাল বাদে পক প্রণালীর সেই দুটো প্রকাণ্ড সাপের কথা ভেবে অলক শিউরে ওঠে ভয়ে। গা ঘেঁষে দুদিকে তার সমান্তরাল সাঁতরে চলেছে দুটো ভয়ংকর বিষধর।

তিন দিন বাদে মনীষা একদিন চড়াও হয় অলকের ওপর, তুই ভেবেছিসটা কী?

কী ভাববো?

তোর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে তা জানিস?

না।

সুছন্দার সঙ্গে।

কথাটা বলে কিছুক্ষণ অপলক চোখে চেয়ে ছেলের মুখে একটা প্রতিক্রিয়া খুঁজল। সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন মুখ, শূন্য ও অকপট চোখ, সুখ দুঃখ কিছুই খেলা করে না ওর মুখে। ওর বাবা বলে, গাছ। তাই হবে। আগের জন্মে বোধহয় গাছই ছিল।

একা ঘরে ফিরে গিয়ে মনীষা একা একা কাঁদতে বসে। সে জানে, সত্যকাম কী চায়। বোকা নির্বোধ ছেলেটা টেরও পাবে না তার আড়ালে ওই শয়তান সত্যকাম আর শয়তানী সুছন্দা কী লীলা করে যাবে। যে কোনও ছুতোয় ঘরে ওই অলক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে সত্যকাম। মনীষা শুনেছে, সুছন্দাও অলকের পিছু পিছু ঘুরঘুর করে। মনীষা কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না ঘটনাটা। ঘটে যাবে। যদি তার নিজের নৈতিক জোর থাকত তাহলে পারত আটকাতে। চতুরলালের ঘটনাটা তো আর মিথ্যে নয়। মস্ত ইমপ্রেসারিও। মনীষাকে সে-ই ইনডোর স্টেডিয়ামের বিশাল ফাংশনে চান্স করে দিয়েছিল। লতা, আশার মতো গায়িকাদের সঙ্গে এক সারিতে তো বসতে পেরেছিল সে। তার জন্য একটু দাম দিতে হবে না? সত্যি বটে,ঝুমুরের সঙ্গে লটকে না পড়লেও পারত চতুর। কিন্তু পড়লেই বা দোষটা কী এমন হয়েছে? চতুরের কত কানেকশন, কত বড় বড় ফাংশন অর্গানাইজ করে। ঝুমুরটাকে ঠিক তুলে দেবে ওপরে।

সেই একটুকু অপরাধের এই শাস্তি। এই প্রায়শ্চিত্ত।

একা একা মনীষা অনেক কাঁদল। এই যে বহু ব্যবহৃত শরীর, যৌবন যায়-যায়,এর কি তেমন কোনও আলাদা শুদ্ধতা আছে? ক'দিন আর? দশ বিশ বা পঁচিশ ত্রিশ বছর পর একদিন ধুকধুকুনি থামবে। কিছু লোক কাঁধে নিয়ে গিয়ে কেওড়াতলায় জ্বালিয়ে দিয়ে আসবে। কী দাম এর?

ডাঙায় বড় ক্লান্তি বেড়ে যায় অলকের। আজকাল তার কেবলই মনে হয়, এক অনন্ত জলাশয় তার দরকার। দরকার নিরেট নির্জনতা। ফোম রবারের চেয়েও নরম ঠাণ্ডা জলে অন্তহীন এক সাঁতার। একদিন ধীরে ধীরে ক্লান্ত অলককে জলই মিশিয়ে নেবে নিজের বুকে। জলে মিশে যাওয়া ছাড়া আর কী করার আছে তার? সে নিজেই এক শান্ত জলাশয়ের মতো নিস্তরঙ্গ, শীতল। সে রাগে না, উত্তেজিত হয় না।

না,হয়েছিল। জীবনে মাত্র একবার। বোধহয় মাত্র ওই একবারই। দাদুর বাড়ির ছাদে সেদিন আচমকা উঠে গিয়ে মেয়েটাকে মুখোমুখি পেয়ে যায় সে। কেন যে সেদিন তার ওই রাক্ষুসে রাগ ঝড় তুলল বুকে।

দোষ নেই অলকের। ওকে যে বহুবার দেখেছে অলক জলে ভেসে থাকতে। ভোরের সুন্দরবনে, গোপালপুরের সমুদ্রে, শেষ রাতে লেক-এর কুয়াশামাখা নীল জলে। জলকন্যা কেন উঠে আসবে ডাঙায়? কেন সে পরের উচ্ছিষ্ট খাবে? কেন হবে পরান্নভোজী? কেন সে চুল শুকোবে রোদে বসে? এইসব প্রশ্নই সে করতে চেয়েছিল। জানতে চেয়েছিল, তুমি কে? তুমি আসলে কে?

মেয়েটা কেন যে অমন ভয় পেয়ে গেল! বুঝতেই পারল না অলক কী বলতে চায়। এক বোবা ভয়ে রেলিং টপকে···

সেই ঘটনার বহুদিন বাদে আজ দাদুর বাড়িতে এল অলক।

প্রথমে টের পেল ঠাকুমা। ঠাকুমাই তাকে বরাবর সবচেয়ে ভাল টের পায়। বনলতা বললেন, অত রোগা হয়ে গেছিস কেন? চোখের কোল বসে গেছে! রাতে ঘুম হয়?

অলক হাসল। তারপর বলল, এবার এক লম্বা সাঁতারে যাচ্ছি, বুঝলে?

কত লম্বা? ক'মাইল?

ঠিক নেই।

তার মানে?

এখনও ঠিক হয়নি কিছু। তবে পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা সাঁতার।

পারবি? দরকার নেই।

দেখা যাক না। মানুষ তো সব পারে।

বেলা এগারোটার রোদে বারান্দায় বসে সৌরীন্দ্রমোহন কোলে প্যাড আর স্কেচ পেনসিল নিয়ে বসেছিলেন। সামান্য রেখায় একটি দুটি ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন আনমনে।

অলককে দেখে বললেন, বোস তো ওই মোড়াটায়। তোর একটা স্কেচ করি।

একটু সময় নিলেন সৌরীন্দ্রমোহন। কিন্তু ফুটিয়ে তুললেন অসাধারণ। অলকের শূন্য চোখ, শীর্ণ হয়ে আসা মুখ, চোখের নিচে বসা—সব এল ছবিতে।

মাথা নেড়ে সৌরীন্দ্রমোহন বললেন, না, তোর চেহারাটা ঠিক এরকম নয়।

অলক হাত বাড়িয়ে প্যাডটা নিয়ে দেখল। বলল, এরকমই। এই তো আমার হুবহু মুখ।

একটা সিকনেস ফুটে উঠেছে না ছবিতে? তুই তো হান্ড্রেড পারসেন্ট ফিট।

ছবিটায় কোনও ভুল নেই দাদু।

সৌরীন্দ্রমোহন তবু সন্দিগ্ধভাবে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অলকের মুখটা ফের দেখলেন ভাল করে। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, স্টিল সামথিং ইজ রং। ভেরি মাচ রং। একটা কিসের যেন ছায়া পড়েছে তোর মুখে। এরকম তো নয় তোর মুখ! এরকম তো হওয়ার কথা নয়!

সংশয়টা বাড়তে দিল না অলক। উঠে এল বারান্দা থেকে।

সিঁড়ির দিকে মুখ করে দেয়ালে ঠেস দিয়ে মেয়েটা দাঁড়ানো। মুখে সেই বোবা ভাব, চোখ-ভরা ভয়। আজ পালাল না। চেয়ে রইল। অলক নিজে প্রায় বোবা। এ মেয়েটা কি তার চেয়েও বোবা?

কে জানে কেন মেয়েটার সঙ্গে আজ একটু খুনসুটি করতে ইচ্ছে হল অলকের। এমন ইচ্ছে তার কোনদিন হয়নি। ইচ্ছেটা হল বলে ভারী অবাকও হল অলক। একটু হাসল সে।

কী খুকী, আজ যে বড় পড়লে না? আমি এলেই তো তুমি হয় সিঁড়ি থেকে না হয় ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার চেষ্টা করো। আজ কী হল?

মেয়েটা জবাব দিল না। মুখটা সামান্য ফাঁক, ঘন শ্বাস পড়ছে, চোখ দুটো স্থির, অপলক।

আবার একটু হাসল অলক। বড় সুন্দর মেয়েটা। জলকন্যা বলে মনে হয়েছিল অলকের। সেই দুপুরে যখন ছাদ থেকে রেলিং টপকে পড়ে যাচ্ছিল তখনই বিভ্রম ভেঙে অলক বিদ্যুতের গতিতে গিয়ে ওকে প্রায় শূন্য থেকে চয়ন করে আনে। আর ভুল করবে না অলক।

সে স্মিত মুখে বলল, ভয় নেই। আমাকে ভয় পেও না। যাচ্ছি।

মেয়েটা জবাব দিল না।

কিট ব্যাগ কাঁধে অলক ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছিল। শেষ ধাপে পা রাখল।

হঠাৎ ওপর থেকে প্রশ্ন এল, তুমি কোথায় যাচ্ছো?

অলক মুখ তুলল। মেয়েটা সিঁড়ির রেলিঙে ঝুঁকে চেয়ে আছে তার দিকে।

যাচ্ছি কোথাও। কেন?

তুমি আর আসবে না?

অলক অবাক হল। মেয়েটা কি কিছু টের পেয়েছে? পাওয়ার কথাই তো নয়। সৌরীন্দ্রমোহন হয়তো পেয়েছিলেন। আর্টিস্টের চোখ তো। কিন্তু স্পষ্ট করে ধরতে পারেননি। এ মেয়েটা কি পেল?

না, সেটা সম্ভব নয়। তাই মেয়েটার দিকে চেয়ে অলকের হঠাৎ সত্যি কথাটাই বলতে ইচ্ছে হল। বললে ক্ষতি কী?

না, আর আসব না।

মেয়েটা অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠল। মুখটা সরে গেল আড়ালে।

অলক ভীষণ অবাক হল। আর্তনাদ করল কেন? অলক আসবে না, তাতে ওর ক্ষতি কি?

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধাভরে দাঁড়িয়ে থেকে অলক সদরের দিকে এগোয়।

একটু দাঁড়াও।

সবিস্ময়ে ফিরে তাকায় অলক।

মেয়েটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে।

কৌতুকের হাসি মুখে নিয়ে অলক বলল, কী চাও?

প্রায় দৌড়ে নেমে এসেছে বলে মেয়েটা হাঁফাচ্ছে। বলল, তুমি কোথায় যাচ্ছো? জলে? আমাকে সঙ্গে নেবে? নাও না।

অলক হাঁ করে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে, আমার সঙ্গে কোথায় যাবে?

জলে। আমিও তো মরতেই চাই। অনেক পাপ হল যে!

মরবে! মরবে কেন?

আমার তো মরতেই জন্ম।

কে বলল ও কথা?

আমি জানি। আমার বাবাও বলত, তুই তো মরতেই জন্মেছিস।

অলক খানিকক্ষণ বিস্ময়ে চুপ করে থাকে। তারপর বলে, আমি আর আসব না একথা তোমাকে কে বলল?

জানি যে। তোমার চোখ দেখে, মুখ দেখে টের পাইনি বুঝি?

তোমার পাপ হয়েছিল? কিসের পাপ?

ভীষণ পাপ। তোমার দিকে তাকাতুম যে? পিসি বারণ করেছিল।

অলক এত হেসে উঠল যেমনটি সে জীবনেও হাসেনি। তারপর সামলে গিয়ে বলল, মরার খুব জরুরী দরকার বুঝি?

মেয়েটা অলকের মুখের দিকে তেমনি ডাগর দুই চোখে নিষ্কম্প তাকিয়ে ছিল। বলল, শুধু বেঁচে থাকতেই যে কত কষ্ট! তুমি তো জানো না, দুটো ভাত, মাথার ওপর একটু চালা, এটুকুও জোটে না যে কিছুতেই। এর

বাড়ি থেকে তাড়ায়, ওর বাড়ি থেকে তাড়ায়। কবেই মরতুম গলায় দড়ি দিয়ে!

তা সেটা করোনি কেন?

একদিন স্টেশনে বটকেষ্টকে দেখলুম যে। চোখ নেই, নাক নেই, হাত নেই, পা নেই, শুধু মুখ আর নাকের জায়গায় দুটো ফুটো। ওকি মানুষ? একটা মাংসের ঢেলা। তবু বেঁচে আছে তো? ভয় হল, বাঁচা কত শক্ত। শুধু বেঁচে থাকাই কত শক্ত। ইচ্ছে যায় না বলো বেঁচে থাকতে? বটকেষ্টরও যদি ইচ্ছে যায় তো আমার দোষ কি?

তবে মরতে চাও কেন?

তুমি যে আর আসবে না। তুমি না এলে কি হবে জানো?

কী হবে?

আবার রোগা ল্যাকপ্যাকে হয়ে যাবো আমি। শরীরে ঘা বেরোবে। কত কী হবে। তুমি এলে বলেই তো আমি সেরে গেলুম।

অলক এ যেন এক রূপকথার গল্প শুনছে। এরকম কেউ তাকে কখনও বলেনি তো! অলকের চোখ জ্বলতে লাগল। শ্বাস গাঢ় হল।

মেয়েটার চোখে স্বপ্নাতুর এক বিভোর দৃষ্টি। সম্মোহিতের মতো। প্রগাঢ় এক স্বরে বলল, তাই ভাবলুম, ও তো চলে যাচ্ছে। এবার তো আমি মরবই। তা হলে ওর সঙ্গে যাই না কেন?

বুক মথিত করে একটা শ্বাস বেরিয়ে এল অলকের। দীর্ঘ এক সাঁতার অপেক্ষা করছে তার জন্য। অপেক্ষা করছে নদী, মোহনা, সমুদ্র। তারপর জলই টেনে নেবে তাকে,জলে মিশে যাবে সে, যেমন চিনি মিশে যায়। তবে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবে জল। সে মেয়েটার দিকে চেয়ে আরও কিছু আবিষ্কার করে নিচ্ছিল।

খুব কষ্ট পেয়েছো তুমি?

মেয়েটা একটু হাসল, কী যে কষ্ট! তবু কি জানো? শুধু বেঁচে থাকাটাও কিন্তু ভীষণ ভাল। শুধু যদি বেঁচে থাকা যায় তাহলেও কত কী হয়। মরব মরব করেও আমার যে বেঁচে থাকতে কী ভালোই লেগেছে কটা দিন। উফ্, কোনওরকমে বেঁচেছিলুম বলেই না একদিন হঠাৎ তোমার দেখা পেলুম। কত কী হয়ে গেল। তুমি ঠিক যেন ভগবান।

অলক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ভারী অন্যমনস্ক, চিন্তিত।

যাবে না?

ভারতবিখ্যাত সাঁতারু আজ জীবনে প্রথম অনুভব করল ডাঙ্গায় যেন প্লাবনের মতো জলের ঢল নেমে এসেছে। ফোম রবারের চেয়েও নরম, সফেন, ঠাণ্ডা জল তাকে আকণ্ঠ ঘিরে ধরল আজ।

বনানী বলল, যাবে না?

সাঁতারু ডাঙ্গার প্লাবনে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃদু হেসে বলল, যেতে দিলে কই?

—